ভাষাসমূহে বহুবিধ প্রবন্ধ, সঙ্গীত * ও নাটক প্রহসনাদি রচনা করিয়া তখনকার গণ্যমান্ত সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, সুকবি ও নাট্যকলা-বিশারদ ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহা যত্নশীল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নাট্যানুরাগী হইয়া বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্যায় ইনিও নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান' প্রভৃতি নাটক প্রহসনাদি সেই চেষ্টার তেম্‌নি ফল। এক কথায় এ প্রদেশে ইঁহারই যত্নে ও আগ্রহে নাট্যাভিনয়ের ও নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাত হয় বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই মহাত্মা তখনকার কালের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত নাট্যসম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা পরামর্শদাতা ও সহযোগী কর্ম্মী বন্ধু ছিলেন। আর এক কথা ইনিই সহোদর রাজা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নাট্যাভিনয়ের সহিত ঐক্যতান বাদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন (এই ঐক্যতান বাদন প্রথা নাট্যশালার অঙ্গবিশেষ হিসাবে ইহার সহিত জড়িত বলিয়া প্রকারান্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে এরূপ সংকল্প রহিল) বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় এই সকল বিষয়েও সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Oriental Theatre এর উল্লেখ কথায় তিনি বলিতেছেন,—It was Babu (since Maharaja Sir) Jotindra mohan Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce native Dramatic representation, and organise a native orchestra on the basis of our native instruments"

---

* বেলগেছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' যখন অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইল, তখন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন স্বয়ংই 'শর্ম্মিষ্ঠা'র জন্য কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিলেন। ঐ নাটকের শেষাঙ্কের শিব পূজা বিষয়ক সুমধুর গীতটি তাঁহারই রচিত। (মাইকেল জীবনী) বোধ হয় এই সকল গীতই তাঁহার সঙ্গীতাদি রচনার প্রথম প্রয়াস।

পাথুরিয়াঘাটার এই সুবিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়ের বহু বর্ষব্যাপী জীবনকাল মধ্যে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছিল। এখানে সেই সকল নাট্যাভিনয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রদত্ত হইল।

১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৬৬ মার্চ) ভবানীপুরে 'অবৈতনিক নাট্য-মন্দির' নামে প্রতিষ্ঠিত এক নাট্য-সম্প্রদায় ৺নীলমণি মিত্রের বাটীতে (হাইকোর্টের সেই স্বনামখ্যাত জজ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগের পুরাতন বাটী) বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'সীতার বনবাস' নামক এক নাটকের অভিনয় করেন। জজ মহোদয়ের ভ্রাতা সুবিখ্যাত পাখোয়াজ শিক্ষক বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিক্ষিত এক একতান বাদন সম্প্রদায় এই অভিনয়ে নাটকাঙ্কের বিরাম স্থানে বাদ্য করিয়াছিলেন।

১২৭৩ বৈশাখে (১৮৬৬ এপ্রেল) পটলডাঙ্গার "আড়পুলি' পল্লীস্থ 'আড়পুলি নাট্যসমাজ' নামধেয় এক নাট্যসম্প্রদায় 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকাভিনয় করেন। ইঁহারা ক্রমান্বয়ে 'শকুন্তলা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চন্দ্রাবলী' ও 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামক নাটক প্রহসনাদি অভিনয় করেন। 'প্রাণীবৃত্তান্ত' প্রণেতা বাবু সাতকড়ি দত্ত এই সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন। সিমুলিয়ার আশুতোষ বাবুর বাড়ীর 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটক দুইখানির সহিত এই আড়পুলির সম্প্রদায়ের নাটক দুইখানি নাকি পৃথক এবং এই সম্প্রদায়স্থ জনৈক ব্যক্তিই ইহাদের রচয়িতা। 'চন্দ্রাবলী' নাটকের রচয়িতা বাবু নিমাই চরণ শীল।

ঐ ১২৭৩ সালের মাঝামাঝি সিমুলিয়া শুঁড়ীপাড়া পল্লীর শুঁড়ী-দিগের বাটীতেই এক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। 'পদ্মাবতী' নামক নাটকখানি এইখানে অভিনীত হয়। বাগবাজার রামকান্ত

বসুর ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বঙ্গে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় একজন প্রধান অগ্রণী ও উদ্যোক্তা, এই সম্প্রদায়ের নাট্য শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং 'কঞ্চুকী'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম অভিনেতা রূপে সাধারণ সমক্ষে বাহির হয়েন। 'নাট্যমন্দিরে' এই নাট্যকলা কুশল অভিনেতা ও স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠাতৃগণের অন্যতম প্রধান ব্যক্তির একখানি প্রতিকৃতি পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছেন ও সেই সঙ্গে সম্পাদক লিখিত ইঁহার নট-জীবনের দু এক কথাও পাঠ করিয়াছেন।

১২৭৩ সালের প্রথমেই ইংরাজি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যমাংশে জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে তদীয় পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে 'জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ' নাম লইয়া এক বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। শোভাবাজার রাজবাটীর প্রাইভেট "থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটী"র ন্যায় ইঁহারাও এক কমিটি গঠন করিয়া সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেন। সুবিখ্যাত লেখক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) মহাশয় এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঠাকুর (প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ রাধানাথের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অভিনীত 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি নাটকগুলির ন্যায় জনসমাজের কল্যাণকর কোনও নূতন নাটকের অভিনয় প্রয়াসী হইয়া ইঁহারা দেশপূজ্য পণ্ডিত-

কুলচূড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ী দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া 'নবনাটক' নামক এক নূতন নাটকের পাণ্ডুলিপি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় গ্রহণ করেন। এবার ও সেই নাট্যকারশ্রেষ্ঠ রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে নারাণ) এই নবনাটক রচনা করিয়া পুরস্কৃত হইলেন। ১২৭৩ সালের ২২শে পৌষ ইংরাজি ১৮৬৭ খৃঃ ৫ই জানুয়ারী এই 'নবনাটকের' প্রথমাভিনয় হয়। ইহার শেষ অভিনয় নাকি ১২৭৩ সালের ১২ই ফাল্গুন (ইং ১৮৬৭। ২৩শে ফেব্রুয়ারী) আট নয় বার এই নাটকখানির অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের এই নাটকাভিনয়ের প্রধান প্রধান অভিনেতা এই কয়জন ছিলেন। বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার, পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি * মহর্ষির পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একে একে অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি বাবু গোরদাস বসাক মহাশয় জোড়াসাঁকোর এই সম্প্রদায়কে উচ্চ সম্মান দিয়াছেন। এখানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের কথা শেষ করিব। "I should not omit to mention here that the sons and nephews of Maharshi Debendra Nath Tagore, already known to fame as a family of geniuses, have been no less distinguished in their endeavours to resuscitate our Hindu Drama. কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও নাকি এই সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের

---

* The representations which they gave, from time to time, in their house, and in which they themselves took the parts of actors, could not be surpassed in respect of the excellence of acting, the exquisiteness of music, and the sweetness of the songs."

অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার সেকালের একজন অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। গৌরদাস বাবু বলেন যে অভিনয়চাতুর্য্যে অক্ষয় বাবু, বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। (In Babu Akshoy Kumar Mazumdar a Jestor of no less distinction than Babu Keshub Chunder Ganguly) জোড়াসাঁকোর এই খ্যাতনামা ঠাকুর বংশ কি সঙ্গীত চর্চ্চায়, কি নাট্যাভিনয়ে ও কি নাট্য সাহিত্যালোচনায় বহুদিন যাবৎ কলিকাতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই মহা শিক্ষিত-বংশের আবালবৃদ্ধবনিতা স্বীয় পরিবার মধ্যস্থ নাট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়া থাকেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয় অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও নাট্যরচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া জনসমাজে উচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাঁহাদের গুণমুগ্ধ নয় এমন লোক এক জনও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন,— "We have in Babu Rabindra Nath Tagore not only a rare actor true to the life, but a songster of superior order and in Babu Jotirindra Nath Tagore a brilliant musician." অদ্যাবধিও এই বংশে নাট্যানুরাগ সমভাবে বর্ত্তমান। মাঘ মাসের ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে এখনও ইহাঁদের ভবনে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীর 'নবনাটক' অভিনয়ের কয়েক মাস পরে ১২৭৪ সালের ৩০শে ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৬৭ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার বাঁধা বটতলার খ্যাতনামা ধনী ৺ জয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে, তাঁহাদের পুরাতন বাটী, ৩১৯ নং অপার চিৎপুর রোডস্থিত ভবনে এক সুন্দর নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকই এ যুগে বিশেষ সমাদর লাভ

করে। পঞ্চানন বাবুও এই 'পদ্মাবতী' নাটকই অভিনয় করান। বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়), মণিমোহন সরকার, জীবনকৃষ্ণ সেন ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ যথাক্রমে 'ইন্দ্রনীল', 'মন্ত্রী, সারথী, কঞ্চুকী ও অঙ্গিরা', 'বিদূষক' 'কলি' ও 'পদ্মাবতী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। বিহারীলাল বাবুই নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ জোয়ালাপ্রসাদ ও সুবাদক নিতাইচক্রবর্ত্তী (বৈষ্ণব) সঙ্গীতাদি শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত মহাশয় স্বয়ং নাকি দুএকটী অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার নানাস্থানে ও সহরতলীতে ভবানীপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে নানা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তবে এ সকল নাট্য-সম্প্রদায়ের কোনটীই স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ ও দু এক কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিব।

চোরবাগানে বাবু কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে Chore-bagan Amateur Theatre নামে এক নাট্যসম্প্রদায় 'ঊষা অনিরুদ্ধ' নাটকাভিনয় করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ংই প্রধান উদ্যোক্তা।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের ৺শ্যামলাল ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও তাৎকালীন প্রসহন লেখক বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে, তাঁহারই রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসন বিশেষের অভিনয় হয়। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীর সেই 'বুঝলে কি না'? প্রহসনের উত্তর স্বরূপ এই 'কিছু কিছু বুঝি'? প্রহসনের উদ্ভব। দেশের কবি, পাঁচালী তরজা ও হাফ্-আকড়াই প্রভৃতি সঙ্গীত সংগ্রামের ন্যায় নাট্যাভিনয়েও এই সময়ে

নাট্যসংগ্রাম চলিতে লাগিল। কয়লাহাটায় অর্থাৎ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট জোড়াসাঁকোয় হেমেন্দ্র বাবুদিগের বাটীতে এই প্রহসন খানির কয়েকবার অভিনয় হয়। এই পুস্তকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় কিছুই ছিল না। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। এই সম্প্রদায়ে আমাদের চিরপ্রিয় রঙ্গরসাবতার হাস্যার্ণব অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও বঙ্গে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রথম পীঠশিল্পী ও নির্ম্মাতা ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু 'দন্তবক্র' 'মুরাদ আলি' ও 'চন্দন বিলাস' নামক তিনটী ভূমিকা ও ধর্ম্মদাস বাবু 'চন্দন বিলাসী' (স্ত্রী-ভূমিকা) গ্রহণ করেন। ইঁহাদের অভিনয় নাকি বেশ ভাল হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' সংগ্রহ কর্ত্তা বলেন কবিবর মধুসূদন নাকি এই অভিনয় দেখিয়া 'মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে' আনন্দ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠেন; অর্থাৎ অন্ত সকলকে মাটী করিল। কিন্তু কবিবরের ঐ চীৎকারটীকে কেহ কেহ এরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে এই অভিনয় 'মাটী' ছাড়া কিছু নয়, অর্থাৎ ইহা একবারে মাটী হইয়াছে, অভিনয় হয় নাই। কবিবর গিরিশচন্দ্র যেমন পরবর্ত্তী সময়ে "National Theatre"এর 'নীলদর্পণ' অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার' অর্থাৎ 'নীলদর্পনে' শৌচ ত্যাগ করিতেছে। 'কিছু কিছু বুঝি'র প্রথম অভিনয় ১২৭৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক, শনিবার (২রা নভেম্বর ১৮৬৭)। *

ও দিকে বহুবাজার অঞ্চলে এক নাট্যসমাজ গঠিত হইয়া সুকবি মনোমোহন বসু মহাশয়ের রচিত 'সতী নাটক' ও 'রামাভিষেক'

* বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন পাঁচালী তরজায় ছড়া ও গান বাঁধিতেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি 'আপনার মুখ আপনি দেখ' নামে একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের প্রহসনসমূহে Slang বা Vulgar বিষয় ও ভাষা অনেক থাকিত।

অভিনীত হয়। মনোমোহন বাবু একজন সুকবি ও নাট্যকার বলিয়া বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ও 'প্রণয় পরীক্ষা' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকাদি ও সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। এই 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকখানি কিছুদিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত Star Theatreএ ও অভিনীত হইয়াছিল। তখন 'রামাভিষেক' নাটকখানি নাকি বহু সমাদর পাইয়াছিল। স্থানে স্থানে এই নাটকখানি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইত। কোন রহস্যপটু রসিক ব্যক্তি শ্লেষ করিয়া এই নাটকখানির 'বর্ণপরিচয়' নাটক নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাবের প্রথমাংশে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত একতান বাদন সম্প্রদায় সমূহের কথা কিছু কিছু আলোচনা করিয়া স্থায়ী নাট্যশালা সমূহের জনক স্বরূপ যে নাট্য-সম্প্রদায় কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের সহিত বঙ্গীয় সাধারণ স্থায়ী-নাট্যশালা চিরজড়িত রহিয়াছে ও থাকিবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রস্তাবারম্ভে আমরা কবিকেশরী রামনারায়ণের পর কবিবর মধুসূদন দত্তের সহিত বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের ও নাট্য-রচনার যোগাযোগ ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

আধুনিক বঙ্গ-নাট্যশালা।

(শ্রীরাধাকিশোর কর লিখিত)

আজ কাল দেখি সব নূতন এক্টার,
বিকট চীৎকার সার ভীষণ হুঙ্কার।
পাঁয়তারা কসে আর তুড়িলাফ খায়,
কি যে বলে মাথা মুণ্ড বোঝা নাহি যায়!
গ্রীক কি ল্যাটিন কিবা নিজ মাতৃভাষা,
বুঝিবার চেষ্টা করা কেবল দুরাশা।
বাঙ্গালীর মুখে বাংলা বুঝিতে না পারি,
নিজ মনে মনে হায় সরমেতে মরি।
এক্টারের মুখ যবে করি নিরীক্ষণ,
নাহি দেখি তাহে কোন ভাবের স্ফুরণ।
কাঁদিছে, কি হাসিছে, কি করিয়াছে ক্রোধ,
মুখ দেখি কোনমতে নাহি হয় বোধ।
ঠিক যেন দেখিতেছি "বিজু থিয়েটার",
ভেদমাত্র তুড়িলাফ, হুঙ্কার, চীৎকার।
কিবা রণে, কি গহনে, কিবা প্রিয়া কাছে,
গলাবাজি লাফালাফি সব তাতে আছে।
বলিহারী শতবার দর্শক মণ্ডলী,
যত উচ্চ চীৎকার তত করতালি।
তারপর, নৃত্যরঙ্গ—কিবা চমৎকার,
কেমনে বর্ণিব বল কি তার বাহার!

'সার্কাস্' দেখিতেছি কিম্বা থিয়েটার,
পদে পদে এই ভ্রম ঘটে অনিবার।
সমগ্র শরীর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের,
সুভঙ্গিম সঞ্চালন—লক্ষণ নৃত্যের।
আধুনিক নৃত্য এক বিকট ব্যাপার,
ভাবিয়া না পাই কোথা তুলনা তাহার।
দপাদপ্ ধপাধপ্ নাচের কি দাপ,
ধুলায় আঁধার সব—একি হল বাপ।
সম্মুখ আসনে বসে হেন সাধ্য কার,
তিলমাত্র নাকের রুমাল খোলা ভার।
ডাম্বেল ভাঁজে কেহ, কেহ ঘুষি ছোড়ে,
লাফ দিয়া ওঠে কেহ অপরের ঘাড়ে।
কভু ওঠে, কভু বসে, কখনও শয়ন,
কুস্তির কসরৎ কভু, কভু বা লম্ফন।
ক্ষুদ্র জীব আমি কিবা করিব বর্ণন,
সার্কাস্ থিয়েটার একত্রে মিলন।
একেত্রেও ত্রুটি নাই—ঘন করতালি,
উপরন্তু ফুলমালা, তোড়া দেয় ডালি।

নিবেদন

কলা-বিদ্যা শিখিবার প্রধান মন্দির,
তার অধোগতি দেখি হয়েছি অস্থির।
প্রাণের আবেগে তাই দুকথা বলিনু,
আরও বলিবার আছে—ভয়ে সম্বরিনু।

ক্ষমা কোরো নাট্যশালা-কর্ত্তৃপক্ষগণ,
বড় দুঃখে এ কাহিনী করিনু বর্ণন।
ইতি মধ্যে পথে যদি না খাই প্রহার,
প্রকাশিব আরও যাহা আছে বলিবার।

বিলাতি রঙ্গিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তখন প্রভাত হইয়াছে।

মূর্চ্ছাভঙ্গে মেরিয়াস দেখিল,—দস্যুপরিবৃতা হইয়া সে গাড়ীতে বন্দিনী।

ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি কোথায়? আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ?" এই বলিয়া অভাগিনী জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল। পরে বুঝিতে পারিল যে ভীষণ বন্ধনে তাহার হস্তপদ আবদ্ধ।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন হাসিয়া বলিল, "তুমি এখন লণ্ডনে আছ সুন্দরী! আমরা তোমাকে তোমারই বসত বাটীতে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া দস্যু আরও বিকট হাস্য করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে অপর দস্যুগণও তাহার শেষ উচ্চহাস্যে যোগদান করিল।

দস্যুগণের বিকট হাস্যে মেরিয়াসের দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল! অবলা রমণী কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর দস্যুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে, তাহারও কিছু উপায় ঠাওরাইতে পারিল না। তাহাদের ভীষণ আকৃতি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, হিংস্র পশুর ন্যায় আচরণ, সহরের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে গমন এবং নিজের নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া মেরিয়াস জীবনের আশা জন্মের মতন পরিত্যাগ করিল। গাড়ী তখন ওয়েষ্টমিনিষ্টার সাঁকোর উপর দিয়া অতি দ্রুত বেগে চলিতেছে।

সাহসে ভর করিয়া মেরিয়াস প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া দস্যুগণ শকট-চালককে আরও দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিল। আদেশ মত অশ্ব যেন অসংযত ভাবে ছুটিতে লাগিল।

মেরিয়াস তথাপি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া একজন পথিক এবং একজন পুলিসের কর্ম্মচারী গাড়ীর ভিতর কোনরূপ মন্দ ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার এবির সম্মুখে গাড়ী জোর করিয়া থামাইলেন। গাড়ী থামাইতেই তাহার চারি ধারে পথের লোক জন দাঁড়াইয়া গেল।

পুলিস কর্ম্মচারী শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিল—"এ গাড়ী কোথা থেকে আস্‌ছে? এত জোরে তুমি হাঁকাইতেছে কেন? গাড়ীতে কে চীৎকার কচ্ছে?"

শকট চালক বলিল—"হুজুর! গাড়ীর ভিতরে যাহারা আছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করুন,—আমি কিছুই বলিতে পারিব না। সমস্ত রাত্রি সকলে মাতাল হয়ে গাড়ীতে হল্লা করেছে—এত বেলা হ'ল তবু গাড়ী ছাড়ছে না! আমি মহা বিপদে পড়েছি—আমাকে আপনারা রেহাই দিয়ে দিন।"

"গাড়ীতে স্ত্রীলোকটা চীৎকার কচ্ছে কে?" দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া পুলিস কর্ম্মচারী পুনরায় একথা জিজ্ঞাসা করিল। একজন অল্প বয়স্ক দস্যু অম্লান বদনে বলিল—"হুজুর ইনি আমার স্ত্রী! ইনি মনে করেছেন যে আমি এঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছি—তাই বিরহের ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে চীৎকার কচ্ছেন। আর এঁরা সব আমার স্ত্রীর ভাই অর্থাৎ আমার সম্বন্ধী গাড়ীতে বসে আমোদ করে এক আধ পাত্র টান্‌ছেন বটে—কিন্তু কেউ বেঠিক হন্‌নি। সকলেই বেশ খাড়া আছেন।"

কথা শুনিয়া পুলীস কর্ম্মচারী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল—সঙ্গে সঙ্গে পথিকগণও যে যাহার গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান করিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নানা কদর্য্য স্থানে ফিরিয়া ফিরিয়া—অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি শেষে পাই ষ্ট্রীটে ডাকাতের আড্‌ডায় উপস্থিত হইল।

অভাগিনী মেরিয়াসের দুর্দ্দশার কথা আর বর্ণনা করিবার নয়। ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, চীৎকারে কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে! আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দুঃখিনী নীরব হইয়া রহিল। দস্যুগণ তাহাকে লইয়া সেই আড্ডায় প্রবেশ করিল। এইবার মৃত্যুদ্বারে উপনীত হইয়াছে মনে করিয়া ভয়ে মেরিয়াসের পুনর্ব্বার সংজ্ঞালোপ হইল।

জ্ঞান হইলে মেরিয়াস চক্ষু চাহিয়া দেখিল একটী অন্ধকারময় অতিক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে তৃণশয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে। কোণে একটী দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া কুটীরে অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ আলোক প্রদান করিতেছে।

কোথায় সে?—ভাবিয়া চিন্তিয়া মেরিয়াস্ কিছুই বুঝিতে পারিল না—এ কোন স্থান?

পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাবলী একে একে অভাগিনীর স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল! মেরিয়াস একবার গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু হায়! দেহ বড় দুর্ব্বল—অভাগিনী কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিল না—মাথা ঘুরিতে লাগিল,—মেরিয়াস সেই তৃণশয্যার উপরে শুইয়া পড়িল! কিছুক্ষণ পরে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অভাগিনী বিকট স্বপ্নসমূহ দর্শন করিতে লাগিল! প্রায় এক ঘণ্টা পরে কুটীরের চাবি খুলিয়া কে যেন ভিতরে প্রবেশ করিল।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের অস্পষ্ট আলোকে মেরিয়াস লোকটীকে চিনিতে পারিল না—কিন্তু বুঝিল যে দস্যুদলের কেহ একজন হইবে।

কর্কশ কণ্ঠে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—"জেগে আছ কি?"

"হাঁ আছি।" ক্ষীণকণ্ঠে মেরিয়াস্ উত্তর করিল! ভয়ে ভয়ে পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কি চাও?"

"আমি কি চাই—দুকথায় বল্‌ছি! আমি কে? চেয়ে দেখ! এই বলিয়া সে ব্যক্তি আলোটী লইয়া নিজের বিকট মুখের সম্মুখে ধরিল।

"তুমি সেই সর্দ্দার?" মেরিয়াস বলিয়া উঠিল।

"হাঁ আমিই সেই বটে! তুমি বেশী গণ্ডগোল করোনা—তোমাকে কিছুকাল আটক করে রাখ্‌ব—"

"কিছুকাল? সে কি? কতদিন?

"তা জানি না!"

"কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? তোমরা কোন্ অধিকারে আমাকে আটক করে রাখ?"

"প্রাণের দায়ে!" এই বলিয়া দস্যুসর্দ্দার পুনরায় কুটীরের চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যহ দুইবার করিয়া দস্যুসর্দ্দার মেরিয়াসকে তথায় প্রাণ ধারণোপযোগী অতি জঘন্য খাদ্য দিয়া যাইত। এরূপ খাদ্য খাইতে মেরিয়াসের যেন প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইত—উদ্গার উঠিত। কিন্তু ক্রমশঃ ক্ষুধার তাড়নায় আর সে ভাব রহিল না। অগত্যা শেষ কদর্য্য আহারই গলাধঃকরণ করিতে হইত।

দস্যুসর্দ্দার মেরিয়াসের কোন কথার জবাব দিত না। মেরিয়াস তাহাকে কত মিনতি করিত—তাহার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিত —"কি অপরাধে আমার এমন শাস্তি"—কিন্তু পাষাণহৃদয় দস্যু কিছুতেই বিচলিত হইত না।

মেরিয়াস স্থির করিতে পারিল না—কত দিন বন্দিনী হইয়া আছে। মোটামুটি হিসাব করিয়া বুঝিল—অন্ততঃ এক পক্ষের কম নয়।

মেরিয়াস ভাবিল—"ভিল্লিয়ার্স কি মনে করিবে? আমার প্রতি তাঁহার কি ধারণা হইবে? আর কি তিনি আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? হয়তো কলঙ্কিনী—বারবণিতা বিবেচনা করিয়া জন্মের মতন আমার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিবেন!"

না—না। মেরিয়াস্ এরূপ কুচিন্তা কখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। ভিল্লিয়ার্স তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—একথা মনে হইলেও তাহাকে শত বৃশ্চিক যেন দংশন করে! এ দুর্ভাবনা মেরিয়াসের মৃত্যুস্বরূপ!

মেরিয়াস ভাবিতে লাগিল—"আমি যেমন করিয়া পারি ভিল্লিয়ার্সের কাছে ছুটিয়া যাইব! তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের কুসন্দেহ দূর করিব। যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে বুঝাইব—আমি কলঙ্কিনী নই—আমি সতী।

কিন্তু কেমন করিয়াই বা রক্ষা পাইবে? এই ভীষণ অন্ধকূপ—কারাগার হইতে মেরিয়াসের পলায়নের পথই বা কোথায়? কিসে অভাগিনী মুক্তিলাভ করিবে? এই সমস্ত দুশ্চিন্তায় তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। অভাগিনী মনে মনে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে ও চেষ্টা করিতে উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু কোনটাই ফলদায়ক হইতে পারে বোধ হইল না। অবশেষে অদৃষ্টদেবী একটু সুপ্রসন্না হইলেন। মেরিয়াসের ভগ্নহৃদয়ে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। মেরিয়াস দেখিল সেই পুরাতন কুটীরখানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কুটীরের প্রাচীরগুলি সমস্তই ভগ্নপ্রায়—কোন রকমে খুঁটির সাহায্যে সেগুলি খাড়া হইয়া রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একখানি ভগ্ন তরবারী পড়িয়া আছে দেখিয়া মেরিয়াস তাহার সাহায্যে—শেষ কারাগার হইতে আপনার মুক্তিপথ প্রস্তুত করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দস্যুসর্দ্দার ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আহার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেরিয়াস সুযোগ বুঝিয়া সেই ভগ্নতরবারীর সাহায্যে কুটীরের প্রাচীরে একটী মনুষ্য যাতায়াতের উপযোগী ছিদ্র প্রস্তুত করিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মস্তক বাহির করিয়া মেরিয়াস দেখিল নিকট অন্ধকার, বাহিরে কিছু দেখা যায় না। তখন ধীরে ধীরে সেই কুটীরাভ্যন্তরস্থিত ক্ষীণ দীপালোকটী আনিয়া পুনরায় ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিল। দেখিল কুটীরের ধার দিয়া এক ভীষণ পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত। সহরের যত আবর্জ্জনা এবং অপরিষ্কার জল সেই পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাবর দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। মেরিয়াস অনুমানে বুঝিল—ইহা নিশ্চয় টেম্‌স্ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। গত্যন্তর না দেখিয়া ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পন করিয়া প্রাণের দায়ে অভাগিনী ধীরে ধীরে সেই

দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীতে অবতরণ করিল। বিপদের উপর বিপদ! অভাগিনীর—কোন দিকেই নিস্তার নাই! সেই পয়ঃপ্রণালীতে অসংখ্য মুষিক বাস করিত। তাহারা মেরিয়াসকে শত্রু বিবেচনা করিয়া সদলে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দংশন করিতে আরম্ভ করিল। মেরিয়াস যথাসাধ্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে—জলের স্রোতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতদূর—কতদূর সেই অবস্থায় চলিতে লাগিল; দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত—মুষিক দংশনে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—পয়ঃপ্রণালী হইতে উপরে উঠিবার কোন উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল বিকট অন্ধকার! মেরিয়াস বুঝিল মৃত্যু নিশ্চিত!

অবসন্নদেহে মেরিয়াস তাহার ভিতরে একস্থানে একটা বড় পাথর দেখিয়া—তাহার উপরে বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা সহজে অনুমান করা যায়! মেরিয়াস ভাবিল—যদি কোন কারণে পয়ঃপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ হয়—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে—কিছুতেই আর প্রাণরক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। কতক্ষণ এইভাবে মেরিয়াস বসিয়া রহিল—তাহা সে বলিতে পারে না। কারণ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভীষণ বিপদসঙ্কুল স্থানে—এই মৃত্যুর দ্বারে বসিয়াও তাহার তন্দ্রানুভব হইতেছিল। পয়ঃপ্রণালীর উপরিভাগে স্থানে স্থানে বায়ু যাতায়াতের জন্য ঝাঁঝরি ছিল; তাহারই মধ্যে দিয়া মেরিয়াস এক একবার আকাশের দুটী একটী তারা দেখিতে পাইতেছিল। অকস্মাৎ মেরিয়াস দেখিল ঝাঁঝরির ভিতর দিয়া প্রভাত সূর্য্যের কর প্রবেশ করিয়া পয়ঃপ্রণালীর সেই ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত করিল! অভাগিনীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল—আবার বাঁচিবার আশা হইল। মেরিয়াস স্পষ্ট শুনিতে পাইল—এবং বুঝিতে পারিল—পয়ঃপ্রণালীর উপর দিয়া অসংখ্য মনুষ্য—গাড়ী ঘোড়া

চলিতেছে। সাহায্যের প্রত্যাশায় সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল—কিন্তু হায়—অবলা রমণীকণ্ঠের সেই ক্ষীণ চীৎকারধ্বনি পয়ঃপ্রণালীপ্রবাহিত জলস্রোতের সহিত মিশিয়া রহিল—তাহার বাহিরে আর পৌঁছিল না! কি সর্বনাশ; এ আবার কি! পয়ঃ-প্রণালীর জল যে ক্রমশঃ গভীর হইতেছে! তবে কি মেরিয়াস যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই হইল? হাঁ—তাহাই বটে! ভীষণ শব্দে প্রতি মুহূর্ত্তে জলস্রোত গভীরতর হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! মেরিয়াসের অবসন্ন দেহ তাহার বেগ আর সহ্য করিতে পারিল না—অবশেষে সেই ভীষণস্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া কোন প্রকারে জলের উপরে মাথা রাখিয়া মেরিয়াস ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এইভাবে ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইয়া, তাহারই উপর ভর করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে যেন আছড়াইয়া কিছুদূরে ফেলিয়া দিল! মেরিয়াস একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিল সে পয়ঃপ্রণালী হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ তরঙ্গসমাকুল নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে! পর-ক্ষণেই ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া মেরিয়াস কাষ্ঠখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিতা হইল!

(ক্রমশঃ)

2̶6̶7̶

বিলাপে প্রলাপ।

(শ্রীকৃষ্ণগোপাল সেন লিখিত।)

১

কেন রে পাগল মন এত বিচঞ্চল!
থেকে থেকে কেন হেন হতেছ বিকল?
কি বেদনা শুনি বল,
অকস্মাৎ উপজিল,
ব্যথার উপরে ব্যথা বাড়াও কেবল!
কেমনে না জানি হায়! হইবে শীতল!

২

ছিল মন একতানে হইয়া বিভোর!
কে তারে হরিয়া নিল কাটি মনডোর!
প্রতিপলে ভাবি তাই,
ভাবিয়া নাহিক পাই,
না জানি কোথায় গেলে পাব মনচোর!
সুখনিশি বল মম কে করিল ভোর!

৩

রাত্রি নাই—দিবা নাই—শয়নে স্বপনে।
আছি মাত্র হ'য়ে ভোর না জানি কি ধ্যানে!
নির্জ্জনে সে মুখশশী,
কেন দেখা দেয় হাসি,
কেন রঙ্গ করে পশি এ পোড়া পরাণে?
পারিব মুছিতে কি সে চিত্র এ জীবনে?

৪

ক্ষুদ্র হৃদাসনে যবে বসাই তাহায়।
কি সুধাসিন্ধুর স্রোতে ভাসায় আমায়!
নিদ্রা আসি চলি যায়,
কিছু প্রাণ নাহি চায়,
কেবল সমস্ত স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়ায়।
কি যেন অজানা পথে টেনে নিয়ে যায়!

৫

পবিত্র প্রণয়পথে শুধু তার স্থান!
মনে মনে স্মরি তারে করি অধিষ্ঠান।
প্রেমের কোমল পাশে,
বাঁধি তারে মৃদু হেসে,
স্মরিয়া সে মুখখানি কাটাব জীবন!
বিভুপদে আপনারে করিয়া অর্পণ!!

268

মেহের-উল-নিসা।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বৃশ্চিকদংষ্ট্র ব্যক্তির ন্যায়, জ্বালাময় দেহে সাহজাদা সেলিম নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত জগত তাঁহার চক্ষে যেন অগ্নিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে বাহিরে ভয়ানক জ্বালা! সে জ্বালার সহিত কিসের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তিনি নিজেই বলিতে পারিতেন না।

রজনীর দ্বিযাম উত্তীর্ণ। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। সেরাজী প্রফুল্ল-প্রাণে একটু সুখের আশায় জ্বালাময় প্রাণকে একটু সুশীতল করিবার জন্য, তিনি প্রথমযামে পত্নীর কক্ষে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে শান্তি পাওয়া দূরে থাক—আবার শতগুণে প্রবলজ্বালা লইয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দ্রুতবিন্যস্ত ক্রোধপরিচালিত, সুদৃঢ় পদক্ষেপে কক্ষতল বিস্তারিত কোমল বশোরার গালিচার উন্নত বক্ষ যেন বেশী করিয়া নুইয়া পড়িতে লাগিল।

সেলিম উত্তেজিতভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সঙ্কেতঘন্টার স্বর্ণ-শৃঙ্খলসংযুক্ত মূল, সবেগে আকর্ষণ করিলেন। বাহিরের প্রস্তরমণ্ডিত দালানে, তিনজন খোজা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ঢুলিতেছিল। তাহাদের তিনজনেই সেই ঘণ্টানিনাদে চমকিত হইয়া সাহজাদার কক্ষের দিকে দৌড়িল।

যে আগে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুর্ণীস করিল, তাহার নাম ওস্মান। সেলিম তাহাকে শূন্যহস্তে আসিতে দেখিয়াই ক্রোধভরে রত্নমণ্ডিত উপানৎ খুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। সক্রোধে বলিলেন—"বান্দার বাচ্ছা! আমি সাকিকে ডাকিয়াছিলাম—তুই আসিলি কেন?"

প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। দীন-ছনিয়ার মালিক, আকবরসার আদরের পুত্র, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট—সাহ সেলিমের, রত্নখচিত উপানৎপ্রহার ত পুষ্পহারের অপেক্ষাও কোমল! খোজা ওস্মান সেই উপানৎ কুড়াইয়া লইয়া সেলিমের পায়ে পরাইয়া দিল।

সেলিম একটু শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—"সাবধান! আর কখনও যেন গাফিলি না হয়। যা—এখনি গিয়া জুলিয়া বাঁদীকে খপর দে। সে যেন খুব ঠাণ্ডা সেরাজী লইয়া আসে।"

সে যাত্রা যে কোতলের হুকুম হইল না, বা কুত্তার মুখে যাইতে হইল না—এই ভাবিয়া খোজাসাহেব নসীবকে খুব জবর মনে করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেলিম এক গজদন্তনির্ম্মিত, মখমল মণ্ডিত, মণিখচিত, দ্যুতিময় আসনে বসিয়া করলগ্নকপোলে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার যত রাগ মানসিংহের উপর পড়িল। মানসিংহ তাঁহার পত্নীর পত্র দেখিবার কে? যদিই বা দেখিল—সে পত্র ছিঁড়িবার অধিকার তাহাকে কে দিল! সেলিম প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"মানসিংহ! একদিন তোমায় এ ধৃষ্টতার ফল ভোগ করিতে হইবে।"

কেন যে এত আগুণ ধরিল, তাহা আমরা একটু বুঝাইয়া বলিব। যোধাবাই, পূর্ব্ব রাত্রে অম্বর যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, এক খরিতা পাঠাইয়াছিলেন। এ পত্রখানি তাহারই উত্তর।

পত্রে যোধাবাইএর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখান হইয়াছিল,

আর তাহার উপর মানসিংহের যথেষ্ট নিন্দাও ছিল। তদুপরি অম্বরে যাইবার অনুমতি ও তাহাতে ছিল না।

চিতোর জয়ের পর হইতেই সেলিম ও মানসিংহের মনে অসন্তোষের সূত্রপাত হয়। মহারাণা প্রতাপসিংহের অভিশাপ যেন হাতে হাতে ফলিল। রাজপুত হইয়া রাজপুতের স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া, মানসিংহ যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এ মনান্তরের প্রধান কারণ যুদ্ধজয়। আকবর সাহের মনের বিশ্বাস, চিতোর বিজয়ে, রাণা প্রতাপের অধঃপতন সাধনের যে কিছু গৌরব সবই—মানসিংহের। সেলিম মনে মনে ভাবিতেন—তিনি সেনাপতি হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই যুদ্ধ জয় হইয়াছিল। কিন্তু এ বিবাদের বিচারকর্ত্তা স্বয়ং দিল্লীশ্বর।

যে দিন দিল্লীশ্বর আকবরসাহ, প্রকাশ্য আম-দরবারে মানসিংহের গলদেশে, চিতোরজয়ের পুরস্কারস্বরূপ এক বহুমূল্য হীরক-খচিত অসি মানসিংহকে উপহার দিলেন, আর সেলিমকে—বহুমূল্য রত্নহার দ্বারা সম্মানিত করিলেন—সেইদিন হইতেই সেলিমের মনে মানসিংহের প্রতি বিরাগ জাগিয়া উঠিল।

মানসিংহ সেলিমের ব্যবহারে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন—যে বাদ-সাহ-পুত্র, তাঁহার এই অযাচিত সম্মানে অতিশয় মর্ম্মব্যথা পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি সেলিমের নিকট আত্মীয়—শ্যালক। তাঁহার পিতা আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, যে ভ্রম করিয়াছেন তাহা সংশোধনের আর কোন উপায়ই নাই। কিন্তু স্নেহময়ী ভগ্নী যোধা—আর তাহার একমাত্র পুত্র খসরুর মুখ চাহিয়া, তিনি সেলিমের এ উপেক্ষায়, মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া উপেক্ষাই দেখাইতে লাগিলেন।

কিন্তু, সেলিম মনে মনে ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞী যোধাবাইয়ের

প্রতি অনুরক্ত হইলেও, মানসিংহের সম্মুখে এরূপ ভাবপ্রকাশ করিতেন যেন—যোধাবাই তাঁহার অবজ্ঞারই বস্তু, কারণ বাদসাহের রংমহালে সুন্দরীর অভাব নাই। সম্রাট-পুত্র, ভবিষ্যৎ সম্রাট, যাহাকে ভাল বাসিবেন, যাহাকে আমার বলিয়া বুকে তুলিয়া লইবেন—সেই তাঁর মাহষী।

সেলিম যোধাবাইএর পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন—তাহাতে যোধাবাইয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম, অফুরন্ত ভালবাসাই প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে সেই পত্রে, তিনি মানসিংহের অনেক নিন্দা করিয়া পত্নীকে বুঝাইয়াছিলেন—যে অম্বরে, তাঁহার শত্রু মানসিংহের আশ্রয়ে থাকা—সম্রাট পুত্রবধু যোধাবাইয়ের পদোচিত কর্ত্তব্য নহে।

মানসিংহের হাতে সেই পত্রই পড়িয়াছে! সেলিম এ পর্য্যন্ত, আকবর সাহের ভয়েই হউক, বা যে কারণেই হউক—প্রকাশ্যভাবে কোনস্থানে সম্রাটের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ মানসিংহের কোন নিন্দাবাদই করেন নাই। কিন্তু যোধাবাইকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীর মনোভাব যাহাই হউক না কেন, তাহা প্রকাশের আশঙ্কা ত সতীসাধ্বী পত্নীর কাছে থাকিতে পারে না। আর মানসিংহ অযথা কৌতূহলবশে সেই পত্র পাঠ করিয়া ভয়ানক ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই ভ্রমের ফলে ভবিষ্যতে নানা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল।

চোরের উপর রাগ করিয়া, কেহ মাটীতে ভাত বাড়িয়া খায় না। কিন্তু সেলিমের সমস্ত ক্রোধ, মানসিংহ হইতে যোধাবাইএর উপর পৌঁছিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর কখনও যোধাবাইয়ের মুখ দর্শন করিবেন না! হায়! বুদ্ধিহীন সেলিম—তুমি করিলে কি? শান্তি সরোবর ত্যাগ করিয়া কেন তুমি স্বেচ্ছায় মরুভূমিতে প্রবেশ করিলে?

সেলিমের সেই অনুতাপদগ্ধ, নিরাশাস্রোতপ্লাবিত, অনুশোচনা পরিতপ্ত আত্মগ্লানি সম্পূরিত, প্রাণের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সেই সময়ে আর একটা রূপের ছায়া পড়িল। সে রূপ—মেহেরউন্নিসার।

সেলিম তখন দেখিলেন—যে তিনি দাবদগ্ধ প্রাণ লইয়া শান্তি সরোবরের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই সরোবরে আশা-সমীর হিল্লোলে, কেবল একটীমাত্র রূপগৌরবময়ী ফুল্লনলিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। মৃদুবাত বিকম্পিত, তরঙ্গরাজিময় সুনীল সলিলের মৃদু আন্দোলনে—সেই অফুরন্ত রূপ-গৌরব-শালিনী ফুল্লনলিনী, ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। সেলিমের কল্পনাচক্ষু যেন কি এক মোহময় সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে অনুপ্রাণিত হইল। সেলিম সেই সলিলবক্ষে ভাসমানা, নলিনীতে মেহেরের অনিন্দ্য রূপের জ্যোতি দেখিতে পাইল। হায়! হায়! সেই ফুল্লনলিনীর অবয়বের প্রত্যেক সৌন্দর্য্যই যে মেহেরউন্নিসার।

সেই প্রস্ফুটিত দলসমূহে যেন তাহার নেত্রের ছায়া। সেই সরল রূপে যেন তাহার হাসির জ্যোতিঃ। সেই মৃদুমলয় বিকম্পিত মধুরান্দোলনে, যেন তাহার ধীরগতি-সঞ্জাত, অঙ্গের ক্ষিপ্রগতিসঞ্জাত, মৃদু আন্দোলন। সেই নলিনীর আরক্ত অৰ্দ্ধমুদিত অর্দ্ধ-বিস্ফারিত দলসমূহে, তাহার মুখের সলজ্জ ভাব! যেন সেই মৃদুতরঙ্গায়িত সুনীল শান্ত-সলিলবক্ষ-শোভিত, মৃদুমধুর মলয়ান্দোলিত, মৃণালিনী ভাষা লইয়া বলিতেছে—"সাহজাদা! এই জলে ভাসিয়া ভাসিয়াই কি আমার এ অফুরন্ত সৌন্দর্য্য কালের কঠোরহস্তে বিচূর্ণ হইবে! এজগতে কি রূপের বিচারক নাই, প্রেমের প্রতিদান নাই, ভালবাসার আত্মসমর্পণ নাই! সবই কি নিষ্ঠুর! তা না হয় যেন সাধারণ মানুষে নিষ্ঠুর হইল, কিন্তু তুমি ত ভাগ্যফলে বাদসাহের বংশে জন্মিয়াছ। তোমারও কি একটু বিবেচনা নাই। তুমিও কি নিষ্ঠুর হইবে?"

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, ভবিষ্যৎ সুখের উন্মাদিনী শক্তিতে, মর্ম্মজ্বালার অবসানে, সেলিম এই কল্পনাময় সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে জুলিয়া স্বর্ণাধারে পূর্ণ তুষারসিক্ত গোলাপবাসিত, সেরাজী হাতে লইয়া সেই কক্ষদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া, মধুর কণ্ঠে ডাকিল—"সাহজাদা"

সাহজাদা, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কে তুমি? মেহের!"

জুলিয়া তাহার রক্তোৎফুল্ল অধরে মৃদু হাসির লহর তুলিয়া বলিল—"না জনাব! এত ভাগ্য আমি করিয়া আসি নাই। আমি সাহজাদার বাঁদির বাঁদী নারীর অধম জুলিয়া!"

সেলিম বিমর্ষস্বরে বলিলেন "জুলিয়া! জুলিয়া! আমার প্রাণ যে দাবানলে পুড়িতেছে—হৃদয় যে বজ্রের তীব্র জ্যোতিতে জ্বলিয়া যাইতেছে!"

জুলিয়া আবার সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে হাসির লহর তুলিয়া বলিল—"সব ঠাণ্ডা হইবে হুজুরালি! এই সেরাজী—আপনার প্রাণের সকল জ্বালা মিটাইবে! জনাবের আদেশে এ বাঁদী—গোলাপবাসিত স্নিগ্ধ সেরাজী আনিয়াছে।

সেলিম, সেই স্বর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া ওষ্ঠাধরের নিকটে আনিলেন। দেখিলেন—সে সেরাজির ঘ্রাণ অতি সুন্দর! তাহার স্পর্শ, তুষার মিশ্রণে অতি শীতল। তাঁহার প্রাণ আগুণে জ্বলিয়া যাইতেছে। তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই তুষারস্নিগ্ধ সেরাজী গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—"জুলিয়া! জুলিয়া! আরাম দাও।"

জুলিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া, আরও একটু মধুর হাসি হাসিয়া, সেই কৃষ্ণতারকাময় সুন্দর চক্ষে, আরও একটু বিদ্যুৎপ্রভা সঞ্চয় করিয়া, সেই স্বর্ণ ভৃঙ্গার হইতে আবার সুবাসিত সেরাজী ঢালিয়া—সাহজাদাকে দিল। সাহজাদা সেলিম, বিনাবাক্যব্যয়ে, সেই রক্তাভ মদিরা গলাধঃকরণ করিলেন।

জুলিয়া আবার মৃদু-হাসির লহর তুলিয়া বলিল "জনাব! আর দিব কি?"

সেলিমের চিত্ত তখন সেরাজীর প্রসাদে, অতি উদার, অতি প্রসন্ন!

প্রাণের সেই গর্জ্জনশীল দাবানল জ্বালা যেন মন্ত্রবলে সরিয়া গেল! প্রাণের চারিধার ব্যাপিয়া, ভীমগর্জ্জনে যে আগুণের হল্‌কা উঠিতেছিল তাহা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নিভিয়া গেল! মরুভূমির মত, রসহীন, তেজোহীন প্রাণ যেন কি এক অজানিত মন্ত্রে সজীব হইয়া উঠিল!

সেলিম আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ মুখে ডাকিলেন—"জুলিয়া!"

জুলিয়া হাস্যমুখে বলিল—"কেন সাহজাদা!"

সেলিম। রমণী মাত্রেই কি এত নিষ্ঠুর!

জুলিয়া। এ আজ্ঞা করিতেছেন কেন!

সেলিম। তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কেন!

জুলিয়া। আমি সাহজাদার বাঁদী মাত্র!

সেলিম। না!—না! সে কথা কে বলে? আমি তোমায় হৃদয়েশ্বরী করিব!

জুলিয়া। এত শীঘ্র?

সেলিম। দুনিয়ার বাদসা আকবর সাহের সন্তান আমি! আমার ইচ্ছা—দুনিয়াকে তোলপাড় করিয়া দিতে পারে!

জুলিয়া। তা কি জানি না জনাব! কিন্তু—দুঃখী বাঁদি আমি, ভয় হয়!

সেলিম। কিসের ভয়!

জুলিয়া। আপনার পরিণীতা পত্নী পাটরাণী!

সেলিম। তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—

জুলিয়া। আর মেহেরউন্নিসা—

সেলিম। সে আমার সুখস্বপ্ন! স্বপ্ন কি সত্য হয় না জুলিয়া? সবার হয় আমার হইবে না কেন।

জুলিয়া। আপনার অন্য স্বপ্ন সবই সত্য হইতে পারে—কিন্তু এটা হওয়া বড় শক্ত!

সেলিম। কেন—

জুলিয়া। তা—জানি না!

সেলিম। আর সহ্য হয় না! তোমায় রূপ যেন রাজকন্যার মত! জুলিয়া! জুলিয়া! তুমি কখনই বাঁদী নও।

জুলিয়া। যদি সাহাজাদার তাই আদেশ হয়, আমিও সদর্পে বলিতে পারি আমি আপনি ছাড়া আর কারও বাঁদী নই।

সেলিম। জুলিয়া!

জুলিয়া। কেন জনাব?

সেলিম। এ হিন্দুস্থান আজ বাদে কাল আমার হইবে! আমার হুকুমে—এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য—রসাতলে যাইতেও পারে কিম্বা—

জুলিয়া। সব জানি! সব বুঝি! কিন্তু আপনি কি আদেশ করিতেছেন?

সেলিম। তুমি আমার কাছে এস! এই স্বর্ণখচিত আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমায় কণ্ঠলগ্ন হও। আমার প্রাণের জ্বালা নিভাইয়া দাও।

জুলিয়া। ছি! ছি! ও কথা বলিতে আছে হুজুরালি! মেহের কি মনে করিবে!

সেলিম। মেহের! মেহের! মনে করিবে! করে করুক। তুমি আমার কাছে এস। এখানে মক্ষিকার প্রবেশ নিষেধ। কেহ জানিবে না।

জুলিয়া। মেহের চুলোয় যাক্—যোধাবাই—কি মনে করিবে?

সেলিম। যোধাবাই ?

জুলিয়া। হাঁ—আপনার ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী !

সেলিম। সেও জাহান্নমে যাউক।

এই সময়ে সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ! সহাস্য মুখে বলিল—"বালাই ! যোধাবাই জাহান্নমে যাইবে কেন সাহজাদা ? যখন নিজের হাতে স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারি, তখন জাহান্নমে কেন যাইব—সুলতান ! জাননা তুমি—হিন্দু রমণীর প্রাণে কত অফুরন্ত পতিপ্রেম ! সে প্রেমে, শত সহস্র স্বর্গের সূচনা হইতে পারে ! সহস্র বৈজয়ন্তী—সে সৃজিত স্বর্গের অনাবিল সুষমা-সম্ভারে পরাজিত হয় !"

জুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রূপগৌরব-মণ্ডিত, হীরক-দ্যুতি-ময়ী, এক স্বর্ণ প্রতিমা ! সে প্রতিমার চোখ দিয়া যেন বিদ্যুৎধারা স্ফুরিত হইতেছে ! সে নয়নে, সে আস্যে—যেন কত ঘৃণা কত বিদ্রূপ ! কত উপেক্ষা !

সেই হীরকমণ্ডিত, দ্যুতিময়ী, স্বর্ণপ্রতিমা, সরোষে গর্জ্জিয়া বলিল—"বাঁদী এখানে বসিয়া কি করিতেছিলি ।"

বাঁদী জুলিয়া কুর্ণীশ করিয়া বলিল—"মা ! হীনবংশে আমার জন্ম নয় ! ভাগ্যদোষে বাঁদী হইতে হইয়াছে—কি করিতেছিলাম, সবই ত দেখিয়াছ—বা শুনিয়াছ মা !"

যোধাবাই প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"হাঁ—সব দেখিয়াছি, সব শুনিয়াছি ! অন্য প্রকার কিছু দেখিলে আমি তোকে কোতল করিবার ব্যবস্থা করিতাম । কিন্তু সাবধান ভবিষ্যৎ বুঝিয়া চলিস্ !"

"কেন মা"

"তোর রূপের জ্যোতি অতি প্রখর ।"

"আপনার তাতে ভয় কি ?"

"পুরুষের মন—কাচের মত! কখন কি হয়।"

"তা সত্য—কিন্তু কার সাধ্য—যে মন তোমার, যে হৃদয়ে তোমার অধিকার, কার সাধ্য তাহাতে পঙ্কিল ছায়া প্রতিফলিত করে।"

"তাও—ত অসম্ভব নয় জুলিয়া।"

"কিসে জানিলে মা?

"তুই কি কিছুই বুঝিস না।"

"বুঝি—খালি তাই নয়—

"কি!

"দেখিতেছি! সর্ব্বনাশী মেহেরউন্নিসা আসিয়া তোমার মত সতী সাধ্বীর সুবিমল ছবি, সাহজাদার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"পারিবে কি!"

"রমণীতে না পারে কি! রমণী হইয়াও কি তাহা বুঝ না মা?"

"কিন্তু আমি পারিলাম কই।"

জুলিয়া এ কথার উত্তর না দিয়া—ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেলিম—এতক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায়, এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে-ছিলেন। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—"যোধাবাই! আমায় মার্জ্জনা কর! আমার মতিভ্রম হইয়াছে।"

যোধাবাই—সেই স্বর্ণখচিত আসনে, সাহাজাদার পার্শ্বে বসিয়া, স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন—"হোক! তাহাতে আমি ভয় করি না। আমার আর কে আছে—স্বামিন্! আমি সোণার সিংহাসনে বসিয়াও, যে তোমার অনাদরে দিনে দিনে ভিখারিণী হইতেছি! তোমার উপেক্ষায়, আমার এ রাণীগিরি যে বাঁদিগিরিতে দাঁড়াইতেছে প্রিয়তম! সাহজাদা! সাহজাদা! সাহজাদা! চল আমরা দুজনে

এ পাপ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। তোমায় দুদিনের জন্য আমি নির্জ্জনে পাইলে—এই কলুষিত মর্ত্তেও আমি স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিব।"

"কোথায় যাইব যোধা! এ পৃথিবীতে, চারিদিকেই যে জ্বালা! মানুষ মাত্রেই যে মানুষের শত্রু!"

"হোক! তাহাতে তোমার আমার ভয় কি! সেখানে থাকিব কেবল—আমি আর তুমি! তোমার ঐ মরুময় হৃদয়ে, প্রেম প্রস্রবণ ফুটাইয়া, প্রকৃত ভালবাসা জাগাইয়া, আমি এক জ্যোতির্ম্ময় নূতন বেহেস্তের সৃষ্টি করিব! আমার হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তকণিকার সহিত যে—প্রেম ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত, তাহার মোহনীয় শক্তিতে, আমি তোমায় চিরদিন অধীর করিয়া রাখিব। তখন তুমি দেখিবে, পত্নীর পবিত্র প্রেমে—সতীর সোহাগে, পতিব্রতার যত্নে, পাষাণের বুক ফাটিয়া জল বাহির হয় কিনা। তখন তুমি দেখিবে এই অশান্তির সংসারে, কত শান্তি—কত প্রেম, কত ভালবাসা—কত অনাবিল স্বার্থগন্ধহীন পবিত্র সোহাগ!

"পারিবে কি ?"

"পারিব—"

"চল—তুমি যেথানে যাইবে তোমার সঙ্গে যাইব।"

"এস—"

সেলিম আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিশাল দেহ সেরাজীর প্রবল শক্তিতে, বাতবিকম্পিত শর-পত্রের ন্যায় মৃদু সঞ্চালিত! সেলিম আবেগভরে যোধাবাইয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কোথায় যাইব প্রাণেশ্বরী!"

"আমার কক্ষে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

"কি প্রতিজ্ঞা যোধা !"

"মেহেরের চিন্তা আর কখনও মনে আনিতে পারিবে না—"

সেলিম চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"যোধা! যোধা! ভাবিয়াছিলাম, তুমি স্বার্থকলঙ্কবিহীনা দেবী মূর্ত্তি! না—না—তা নয়। তুমি পিশাচী। আমি সব ছাড়িতে পারি। এ রাজ্যের আশা রাজসিংহাসন, সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু আমার চিত্তের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারি না, আমার সুখ স্বপ্নময় চিন্তা ছাড়িতে পারি না।"

নিশ্চল প্রাণহীন শুভ্র প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া, যোধাবাই এই নিদারুণ কথাগুলি শুনিল। সে বুঝিল—অদৃষ্টের বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। কর্ম্মসূত্র যখন বিপথে মানুষকে চালিত করে, তখন তাহার সকল বুদ্ধিই লোপ হয়। সে বুঝিল—মেহের, রাহুরূপে, সুদূর ইরাণ হইতে আসিয়া তাহার সুখসূর্য্য জন্মের মত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।"

সেলিমও—চিন্তামগ্ন। তিনি আজ প্রাণের উত্তেজনা বশে—তাহার ধর্ম্মপরিণীতা পত্নীর সম্মুখে একটা মহা পাপের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যে তাঁহার চিত্তসুখের জন্য রাজ্ঞীত্ব ছাড়িতে প্রস্তুত, নারীজীবনের সকল সুখই ত্যাগ করিতে উদ্যত, যে চিরলাঞ্ছিতা উপেক্ষিতা, অপমানিতা হইয়াও ক্রোধ শূন্য—তাহার মুখের উপর এ কথাটী বলা কি ঠিক হইল। কাজটা কি ভাল হইল! অভিমানিনী, আত্মসম্ভ্রম-গৌরবিনী, পতিপ্রেমানুরক্তা রাজপুতবালা—একথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইয়াছে।

যোধাবাইএর দৃষ্টি উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সংন্যস্ত। তিনি দেখিলেন সেই গম্ভীর নিশীথে নীলাকাশে, উজ্জ্বল তারারাশির জ্যোতিকে মলিন করিয়া, নিশানাথ সমগ্র প্রকৃতিকে রজত-স্রোত-প্লাবিত করিতেছেন। রক্তপ্রস্তরময় দুর্গ মিনারের অতি উচ্চ স্থানে, চন্দ্র কিরণ পড়িয়া

তাহাকে উজ্জলিত করিয়াছে। কলনাদিনী সুনীল সলিলপ্রবাহপূর্ণা, তরঙ্গ-ভঙ্গ-রঙ্গ-মধুরা, যমুনার বুকে সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র-কিরণ পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। যোধাবাই বুঝিলেন—ভগবানের রাজ্যে, এই শান্ত, প্রোজ্জ্বল চন্দ্রকর লেখামণ্ডিত নিশীথে, সকলেই হাসিতেছে—কেবল দুইজন মাত্র মণিখচিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্বেচ্ছাপুঞ্জিত নরকের অন্ধকারে ডুবিয়া প্রাণের যাতনায় অধীর হইতেছে।

সেলিম—এক রত্নখচিত মর্ম্মরস্তম্ভের উপর হেলান দিয়া মহা অপরাধীর মত কি ভাবিতেছেন।

যোধাবাই সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"সাহজাদা! আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

সেলিমেরও চমক ভাঙ্গিল। তিনি সেই স্বর্ণখচিত স্তম্ভাংশের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—কম্পিতস্বরে বলিলেন—"কি প্রার্থনা যোধাবাই ?"

"আমি একটা অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিলাম।"

"কিসের অনুমতি ?"

"আমি কাল প্রভাতেই অম্বরে যাইব।"

"অম্বরে যাইবে! মানসিংহের আশ্রয়ে! কেন ?"

"এক হৃদয়ে দুইজনের স্থান হইতে পারে না, এক প্রাসাদে দুইজন অধীশ্বরী থাকিতে পারে না।"

"বাদসার রংমহলে ত তার অভাব নাই।"

"না থাকিতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ—সহস্র প্রেমপাত্রী থাকিলেও অধীশ্বরী একজন।"

"আমার নিকট এজন্য অনুমতি চাহিতেছ কেন ? আকবর-সার আদরিণী পুত্রবধূ তুমি! তাঁর কাছে যাও। পিতা বর্ত্তমানে—আমার কোন স্বাতন্ত্র্যই নাই। যিনি এ দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁহার হুকুমে মানুষের মাথা যায়, মাথা থাকে, তাঁহার কাছে যাও।"

"কিন্তু আমি পত্নী! স্বামীর অনুমতি না হইলে, আমি আগরা ছাড়িতে পারিব না।"

সেলিম উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে, স্নেহময় মুখে, প্রেমাপ্লুতস্বরে বলিলেন, "না—না, যোধা! আমি তোমায় অনুমতি দিব না। তুমি আমার উজ্জল বৈজয়ন্ত। নরকের জ্বালায় যখন এ প্রাণ পুড়িয়া ছারখার হয়, তখন তোমার কাছে শান্তির আশায়, ছুটিয়া যাই। যখন এ নিষ্ঠুর জগতে সকলের নিকট অনাদৃত উপেক্ষিত হই—তখন তুমি আমায় আদর কর। যখন দারুণ মর্ম্ম যাতনায়, এ বিশ্ব আমার চক্ষে তলাইয়া যায়, তখন তুমি প্রাণের মহত্বে এক নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আমায় আশ্রয় দাও—কোথায় যাইবে প্রাণেশ্বরী! এ হতভাগ্য সেলিমকে, প্রচণ্ড হুতাশনের মুখে—ফেলিয়া কোথায় যাইবে নিষ্ঠুরে?"

যোধাবাই ক্রোধ ভুলিলেন। তাঁহার বিষাদ গম্ভীর অভিমান-মণ্ডিত মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি সেলিমের পদ-প্রান্তে বসিয়া, তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"তুমি যখন নিষেধ করিতেছ—তখন যাইব না। কিন্তু যদি এখানে থাকিতে হয় ত রাজরাজেশ্বরীর মত থাকিব। মেহেরকে আর এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দিব না। তোমাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব। না—করি, আমি রাজপুত কন্যা নই—আকবর সাহের পুত্রবধূ নই, সুলতান সেলিমের পত্নী নই।"

আর কিছু না বলিয়া যোধাবাই, বিদ্যুৎবেগে মুহূর্ত্তমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"যোধা! যোধা—ফিরিয়া এস।"

সুলতানের প্রেমপূর্ণস্বর সেই মর্ম্মর খচিত কক্ষে, কেবল একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলিল। যোধা আর ফিরিল না। (ক্রমশঃ)

বাণী-বন্দনা। *

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

প্রণমি চরণে মা বীণাপাণি ! শুভ্রবরণা সরোজবাসিনী,
কৃপায় তার' গো দুস্তরসাগরে বেদবিদ্যাপ্রসবিনী,
মূঢ়জনদুঃখনাশিনী মা জ্ঞানবুদ্ধিদায়িনী ॥
রজত-জোছনা-আলোক জিনি,
সিতবরণে দিক-প্রমোদিনী,
ফুল্লপঙ্কজে সুন্দর শোভিনী, কটাক্ষে ঈক্ষণ করগো জননী ॥
মধুর ঝঙ্কারে বীণা বাজে,
চরণপঙ্কজে ভ্রমর গাজে,
ভুবনমোহিনী উজ্জ্বল সাজে,
বিরাজে রাগ-রাগিণী-রাণী ;
দীনজন কাতর বচনে,
নিবেদি গো দেবী তোমার চরণে,
অজ্ঞান-আঁধারে পূর্ণিত অন্তরে, দেহি আলোক প্রসন্নয়নী ॥

---

* রাগিণী ভৈরবী, তাল ধামার।

স্বপনে।

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত)

নিশিশেষে আজি দেখিনু স্বপনে
দেবীর মুরতি কমলআসীনা,
আসে পাশে চারিধারে তার
উঁকি মারে উষা সোণালি বরণা।
চরণসরোজ চুমিয়া চুমিয়া
আকুল সমীর বহিয়া যায় ;
মরাল মরালী গ্রীবাটী তুলিয়া
দুলিয়া দুলিয়া ভাসিছে হায়।
মুগধ সরসী রহেছে চাহিয়া
প্রবাহ রুধিয়া স্তিমিত নয়নে,
মুখ পানে তাঁর চাহিয়া চাহিয়া
ফুটিছে নলিনী প্রভাত জীবনে।
খেলিছে বীণাটি ক্রোড়েতে তাঁহার
সপ্তসুর তায় নীরবে ঘুমায়,
হেরিছেন দেবী চাহিয়া চাহিয়া
সম্মুখে সন্তান পূজিছে তাঁহায়।
ক্রৌঞ্চী-দুখে বিহ্বল কাতর মুনি
যোগেতে মগনা সম্মুখে বসিয়া,
পূজিছেন মার চরণ দুখানি
ব্যাস কালিদাস পিছনে বসিয়া,

ভারত বঙ্কিম, প্রসাদ ঈশান
নবীন মধু হেম কৃত্তিবাস,
বিহ্বল বিহারী বিহ্বল নয়নে
খুঁজিছে কোথায় সারদা আবাস।
অকস্মাৎ ধ্বনি পশিল শ্রবণে
কহিছে সকলে গম্ভীর বদনে,
চলিছেন মা ভুলোক দর্শনে
ব'রে লও তাঁরে সকল সন্তানে।
অকস্মাৎ মোর ভাজিল স্বপন
আকুল নয়নে রহিনু চাহিয়া
উঁকি মারে উষা গবাক্ষ ভেদিয়া,
নাচে তরু লতা হাসিয়া হাসিয়া।
বসন্ত আরম্ভে শীত অবসানে,
সেজেছে প্রকৃতি নবীন বরণে,
জননী তাই আসিছেন হেথায়
ঢালিতে আশীষ আজিকে ভুবনে,
কে আছ কোথায় ছুটে সবে আয়
পূজিতে আজিকে মায়ের চরণে।

আবাহন।

(শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত)

১

দীর্ঘকাল পরে এসেছে আবার
হৃদি কুঞ্জবনে অমর-বালা !
ঘুচিয়া গিয়াছে মনের আঁধার,
পরাণে প্রেমের তরঙ্গ খেলা।

২

কাহার শ্রীকর-কমল পরশে
বাজিয়া উঠিল হৃদয়-বীণা ?
আতট তরঙ্গ মানস-সরসে
কেবা সে মরালী তুলিল নানা ?

৩

কার কলকণ্ঠ পশিয়া শ্রবণে,
মরমে মরমে মারিল তান !
আকুল করিয়া অভাগা পরাণে,
গাইল অমরাবতীর গান !

৪

বহু বর্ষব্যাপী হিমানীর পর
সরস বসন্ত কেন রে এল ?
শত অমানিশা ঘোর অন্ধকার
দামিনী চমকে মিলায়ে গেল !

৫

কে তুমি রূপসী পরাণ-রঞ্জিনী,
আনন্দ-দায়িনী মহিমাময়ী,
রূপে গুণে মোর মানস-মোহিনী,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রয়েছ ওই ?

৬

কে গো তুমি বালা উদয় হইয়ে,
শান্তি-সুধা ঢাল পরাণে মোর,
আনন্দের স্রোত হৃদয়ে ঢালিয়ে,
নূতন প্রেমেতে করগো ভোর !

৭

এ হৃদি বিপিনে নিভৃত নিকুঞ্জে
বসে না কোকিল, গায় না গাথা !
নাহি ফুটে ফুল, অলি নাহি গুঞ্জে
হেরি বুক জোড়া বিষাদ ব্যথা !

৮

পাপিয়ার গান, দয়েলের তান
উঠে নাই কভু হৃদয় বনে,
শুধু দীর্ঘশ্বাস ভরা এ পরাণ,
শুধু হা হুতাশ এ (পোড়া) মনে !

৯

শুধু তুমি দেবি, সুরসীমন্তিনী,
ক্ষণে ক্ষণে আসি উদয় হও !
শুধু তুমি রাণী, হৃদয়চারিণী,
দামিনীর সম মানসে রও !

১০

তাই ক্ষণে ক্ষণে, এ ভগ্ন বিপিনে
নন্দনের শোভা ফুটিয়া উঠে!
তাই ফুটে ফুল ধীর সমীরণে,
স্বর্গ-সুধা-গন্ধ উথলি ছুটে!

১১

তাই গো তখনি আসে পিকবর
হৃদি সহকারে গাইতে গান!
দয়েল, পাপিয়া ঢালি মধুস্বর,
মাতাইয়া তোলে অভাগা প্রাণ!

১২

তাই করি সাধ হে সুর-সুন্দরী
আজীবন তোমা' মানসে সেবি!
দাসে কৃপা করি এস সুরেশ্বরী!
দীন হীনে চাল করুণাদেবি!

শ্মশানঘাটে গিরিশচন্দ্র।

ভীষণ শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর শোক-সহকারে প্রকাশ করিতেছি—বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়াছে ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে—সরস্বতীর পবিত্র মন্দিরে প্রতিভার দুইটি দিব্য দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে! শোকান্ধকারে আজ বঙ্গের সাহিত্যজগত সমাচ্ছন্ন!

গত ২১শে মাঘ রবিবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বঙ্গের বর্ষীয়ান লেখক, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহোদয় চুরাশী বৎসর বয়সে অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যের উপর আবার দুর্ভাগ্য!—মনোমোহনের বিয়োগ-ব্যথা লাঘব হইতে না হইতে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যচার্য্য, বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্বজনবিদিত নাট্যরথী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় ৬৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

শোকবারণ ভগবান স্বর্গীয় মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্রের শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইল। গিরিশ-চন্দ্রের লিখিত "নাট্য-কলা" এবার নাট্যমন্দিরের পাঠকগণ উপভোগ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর নাট্যা-চার্য্য লোকান্তরিত হন। "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" প্রবন্ধটীও যখন ছাপা হয়—তখনও তিনি জীবিত; সেইজন্যই উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার অস্তিত্বের আভাষ সূচিত হইয়াছে।—এই কারণেই আমরা মাঘ মাসের সংখ্যা স্বতন্ত্র প্রকাশিত না করিয়া গিরিশচন্দ্র ও মনোমোহনের বিয়োগবার্ত্তাসহ—একত্র প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্র।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য,—বঙ্গভূমির বরপুত্র, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় ভক্ত, বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদাতা, নাট্যসাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট, নাট্যাচার্য্য, নটকুলকেশরী, বঙ্গবিশ্রুত-কীর্ত্তি গিরিশচন্দ্র নশ্বর নরলোক ত্যাগ করিয়া দিব্যধামের পথিক হইয়াছেন,—সর্ব্বজয়ী সাহিত্য-রথী সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সাধনোচিত ধামে যাত্রা করিয়াছেন!

বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের সর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আজ অস্তমিত! বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব—বাণী ও রমার বরপুত্র সর্ব্বজনপ্রিয় মহাপুরুষের পূতপবিত্র জীবন-প্রদীপ আজ মহাকালের একটি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত!—সেই সৌম্য স্নিগ্ধ, চিরসুন্দর, প্রতিভার অবতার নাট্যগুরু ভৌতিক দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া এতদিনের পর মর-সম্বন্ধের অতীত হইয়াছেন,—হায়! নিরুপায় অসহায় দুর্ব্বল মানবকে গুরুর প্রতিমাও অনন্ত কালসাগরে বিসর্জ্জন দিতে হয়!—নিয়তির এমনই কঠোর নির্ব্বন্ধ!

বাঙ্গালায় আজ শোকদুঃখের অবধি নাই! সমগ্র বঙ্গভূমি আজি শোকতাপের হাহাকারে পরিপূর্ণ! বঙ্গের রঙ্গভূমি বিষাদের ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন! হায়,—এতদিনে দুর্ভাগ্যদেশে নাট্যজগতে পুরাতনের সাক্ষী প্রায় লুপ্ত হইল,—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধন-গ্রন্থি প্রায় ছিন্ন হইয়া গেল, বাঙ্গালীর গৌরব-রবি অস্তমিত হইল! হায় মা বঙ্গভূমি তোমার

"একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটী
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী!"

তোমার দুর্ভাগ্যের অবধি নাই! তোমার বক্ষের উজ্জ্বল নিধি, তোমার গৌরব ও গর্ব্বের সার সামগ্রী অন্তর্হিত হইল! বঙ্গের সুমেরুচূড়া শ্মশানভস্মে মিশিয়া গেল! বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য শোচনীয়।

"অনন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্!"—কে কাহার জন্ত শোক করে? কালের অনন্ত প্রবাহে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কোটী কোটী জীব বুদ্বুদের ন্যায় উদ্গত ও বিলীন হইতেছে,—কে তাহা গণনা করে? কিন্তু এই কাল-প্রবাহে কদাচিৎ এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের তিরোভাবে বর্ত্তমানের শ্মশানে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হয়,—সমগ্র দেশ যাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। গিরিশচন্দ্র এই শ্রেণীর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, ভাগ্যবান কর্ম্মবীর। তাই আজ সমগ্র বঙ্গে—ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে বিলাপ ও হাহাকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা বঙ্গের প্রান্তরে, অরণ্যে, পর্ব্বতে, নগরে, গ্রামে, শ্মশানে, সর্ব্বত্র কল্পনার নেত্রে গিরিশের ছবি দেখিতে পাইতেছে। তাই আজ গিরিশের গুণমুগ্ধ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী হৃদয়ে হৃদয়ে গিরিশচন্দ্রের সত্তা অনুভব করিতেছে।

জীবনস্রোতে জীব ভাসিয়া যায়।—"চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?"—ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবন-নদের নীরও চিরস্থির নহে; তিনিও সেই অনন্তপথের পথিক। মর-জগতের কোনও বন্ধন অনন্তের যাত্রীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, দু'দিনের পান্থশালা পড়িয়া থাকে,—মানব অনন্তের প্রবাহে ভাসিয়া যায়। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেই পথে,—অমরার সেই কবিকুঞ্জ পথে—যেখানে ঈশ্বর, বঙ্কিম, হেম, নবীন, রমেশ, দীনবন্ধু, যোগেন্দ্র, মনোমোহন, সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন,—সেইখানে সসম্মানে সম্মিলিত হইয়াছেন।

চরিত্র-চিত্র !

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালা দেশের সমুজ্জ্বল রত্নভূষণ। গিরিশচন্দ্রের জীবন প্রতিভার দান। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা উপাদানে, নানা উপকরণে গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের পূজা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-জননীর চরণে যে অর্ঘ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, অমূল্য, অতুলনীয়। গিরিশচন্দ্রের প্রদত্ত এই অর্ঘরাজি—অমূল্য নাট্যরত্নাবলী—মায় ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব সম্পদ; ভাগ্যবান সুকৃতিশালী পুত্রপ্রদত্ত এই অপূর্ব্ব রত্নরাশি ভাণ্ডারজাত করিয়া জননী বঙ্গভাষা আজ গৌরবান্বিতা;—এমন কৃতিমান পুত্রের বিয়োগে তাই আজ তিনি শোকে দুঃখে মূহ্যমানা।

গিরিশ-সৃষ্ট সাহিত্যের মূল উৎস,—গিরিশের প্রতিভা। প্রতিভার বলেই তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, নাট্যকলাকুশল, নাট্যাচার্য্য, নাট্য-জগতের চক্রবর্ত্তী সম্রাট, সাহিত্যের উজ্জ্বল কোহিনুর, সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই; তত্রাচ তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনেক উপাধিধারী বিদ্যাদিগ্‌গজকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। উপাধিশূন্য হইয়াও কঠোর সাধনা ও প্রতিভার প্রভাবে মানুষ যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে,—গিরিশচন্দ্র লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহার উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পুণ্যবলে যে প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, সংসারে তাহার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-সমাজে তাঁহার আদর্শের প্রভাব অল্প নহে।

গিরিশচন্দ্র জ্ঞানে গরিষ্ঠ ও বিদ্যায় মহান হইয়াছিলেন। স্বগৃহে

সযত্নপ্রসূত প্রগাঢ় অধ্যয়নে তাঁহার রুচি মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছিল। সেই সুকুমার রুচির পরিচয় যে পাইয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। চিত্রে, সাহিত্যে, তৌর্য্যত্রিকে তিনি সৌন্দর্য্য ও সুরুচির সাধনা করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত, সুরসিক, মিষ্টভাষী, সদাচার, অমায়িক, শিষ্টাচারী, সুকবি, সুলেখক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যাচার্য্য, নটরাজ, স্নেহশীল, গুণগ্রাহী, ধর্ম্মানুরাগী, বন্ধুবৎসল—কোন্ বিশেষণ গিরিশচন্দ্রের পক্ষে অযথ নহে? সাহিত্যিক-সমাজে তিনি সৌজন্যের ও বিনয়ের অবতার ছিলেন।—সমদর্শী, বন্ধুবৎসল, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের হিতাকাঙ্ক্ষী জনপ্রিয় গিরিশচন্দ্র মধুর চরিত্রে মধুর ব্যবহারে সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতিরঞ্জন নহে;—সত্য।

গিরিশচন্দ্রের রামকৃষ্ণভক্তি ও মহাজনগণের প্রতি শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। আশ্রিতবাৎসল্য, আত্মীয়বান্ধবে প্রীতি, ভক্তজনে অনুরাগ তাঁহার চরিত্রের ধর্ম্ম ছিল। সৌভাগ্যক্রমে লেখক তাঁহার প্রীতি ও স্নেহের অধিকারী হইয়াছিল। সে স্নেহের নির্ঝর শুষ্ক হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র মধুর স্মৃতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরকাল স্মরণ করিব! যে একবার গিরিশচন্দ্রের পবিত্র স্নেহে ধন্য হইয়াছে, সে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে কি?

বাঙ্গালার গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, নবভাবের অমর-কাহিনীর প্রথম অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের স্মরণীয় মহনীয় জীবন চিরমুদ্রিত হইয়া আছে,—ভবিষ্যতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্ণাক্ষরে তাহা দেদীপ্যমান থাকিবে। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। রামকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, নবীনচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধু, ঈশ্বরগুপ্তের প্রিয় শিষ্য গিরিশচন্দ্র সে কালের স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় বাঙ্গালায় বিরাজ করিতেছিলেন। কাল-সমুদ্রের তরঙ্গে তাহা ভাসিয়া গেল!

বঙ্গের নাট্যশালা আজ গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে তমোময়। পঞ্চাশ বৎসরের কথা,—যখন এই শিশু নাট্যশালার স্চনায় উদ্যোগের ভান ছিল, উদ্যোগ ছিল না; চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল না; কামনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কিন্তু উপাদান উপকরণ ছিল না।—এই নাট্যশালার যখন সূত্রপাত হয়,—তখন কে জানিত, নাট্যকলা জননীর একনিষ্ঠ সাধক পুত্র গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে একদিন এই নাট্যশালা বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিবে? কে ভাবিয়াছিল, নাট্য-জগতের উর্বরক্ষেত্রে—যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের জীবন-পণ চেষ্টায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে, হৃদয়ের শোণিত সেচনে একদিন তাহা মহা-দ্রুমে পরিণত হইবে? যাহা স্বপ্ন ছিল, আজ তাহা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা কামনার কল্পলোকে আকাশকুসুমের ন্যায় ফুটিয়াছিল, তাহা প্রকৃত অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রই বঙ্গীয় নাট্যশালার ভাগ্যবান পুণ্যবান স্রষ্টা। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফলে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে, বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশে, প্রতিভার পুণ্যপ্রভাবে গিরিশচন্দ্র নাট্যজগতে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সে স্মৃতি কি ভুলিবার? বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত গিরিশ চন্দ্রের সম্বন্ধ চিরদেদীপ্যমান। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে ভাবের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সে সম্বন্ধ কি কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে?

না,—সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; সে সম্বন্ধ ভুলিবার নহে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। নাট্যগুরুর ভৌতিক দেহের তিরোভাব হইয়াছে,—কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রভাব সমগ্র বঙ্গে, সমগ্র ভারতে বৈদ্যুতী-শক্তি বিকীর্ণ করিবে। নশ্বর জগতে সব যায়, কিন্তু স্মৃতি থাকে; কীর্ত্তি থাকে।—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।—গিরিশচন্দ্র মর্ত্ত্যের মায়া-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন;—আজ তিনি লোকচক্ষুর অতীত; কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার কীর্ত্তি অমর

হইয়া রহিবে। তাঁহার সমুজ্জ্বল আদর্শ বাঙ্গালাদেশে চিরদেদীপ্যমান থাকিবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সেই উন্নত আদর্শের প্রভাবে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হইবে। গিরিশচন্দ্রের নর-জীবন-দীপ কালের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার দেদীপ্যমান কীর্ত্তি, তাঁহার অমূল্য নাট্যগ্রন্থাবলী, তাঁহার সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা, তাঁহার সর্ব্বরসসমন্বিত গীতিসমূহ বাঙ্গালাদেশে চিরদিন জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে,—বাঙ্গালার নাট্যশালায়, বাঙ্গালীর আবাস-ভবনে গিরিশচন্দ্রের কাব্যপ্রদীপ চিরদিন পবিত্র স্নিগ্ধরশ্মি বিতরণ করিবে।

গিরিশচন্দ্রের কবি-প্রতিভার উন্মেষ—কবিত্বে ও সঙ্গীতে, বিকাশ—অভিনয়ে ও নাটক রচনায়। তাঁহার প্রথম রচনা—রামায়ণের করুণ প্রসঙ্গ "রাবণ বধ"। গিরিশচন্দ্র অবিশ্রান্ত কবি ছিলেন। ক্রমেই তিনি মাতৃভাষার পূজায় মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার ফল,—পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও হাস্যরসোজ্জ্বল নানাবিধ অমূল্য নাট্যগ্রন্থাবলী। বাঙ্গলার সুখ দুঃখ, বাঙ্গালীর পাপ তাপ, বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য লইয়া গিরিশচন্দ্র "প্রফুল্ল" ও "বলিদান" রচনা করেন। এই দুইখানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর জীবন সমবেদনায় সিক্ত করিয়াছেন,—বাঙ্গালীর রুচি মার্জ্জিত ও প্রবৃত্তি উন্নত করিয়াছেন।—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেলো!"—"বাঙলায় কন্যাদান নয়—বলিদান!"—এমন মর্ম্মভেদী বাণী আর কি কাহারও মস্তিষ্ক হইতে কখনও উদ্ভূত হইবে?

ইতিহাসের গহন কাননে প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন,—তিমিরমগ্ন বধির বাঙ্গালীর কর্ণে এক অপূর্ব্ব অবদান-অমৃত সেচন করিয়াছেন। তাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" "মীরকাশিম" "ছত্রপতি" প্রভৃতি গ্রন্থরাজি নাট্য-

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গিরিশচন্দ্র স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত হইয়া কখনও উদ্দাম উন্মাদনায় বাঙ্গালীর তন্দ্রাদূর করিয়াছেন। কখনও অতীত গৌরবগাথা কীর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালীকে অশ্রুধারায় সিক্ত করিয়াছেন। শেষ জীবনে গিরিশচন্দ্র সমাজ ও ইতিহাসের পথে ধীরে ধীরে শাশ্বত আর্য্যধর্ম্মের পবিত্র তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফল,—"শঙ্করাচার্য্য" ও "তপোবল"।—এই "তপোবল"ই তাঁহার শেষ জীবনের পূর্ণাহুতি। তপোবলের প্রভাবে তপোমণ্ডিত গিরিশচন্দ্র আজ তপস্বী-বাঞ্ছিত ত্রৈলক্যধামের পথিক।

রোগশয্যা।

গত কয়েক বৎসর হইতে গিরিশচন্দ্র শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখনও তিনি কাতর হইতেন, আবার কখনও বা সুস্থ থাকিতেন। এবার পূজার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রোগ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূজার পর মধ্যে আবার একটু সুস্থও হইয়াছিলেন। মাঘমাসের প্রথমাংশে গিরিশ বাবু "নাট্যমন্দিরে" প্রকাশার্থে এই প্রবন্ধের লেখকের হস্তে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি দিবার সময় তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ছাপিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন একবার প্রবন্ধটীর প্রুফ দেওয়া হয়। তদনুসারে গত ২০শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যার সময় লেখক প্রবন্ধটির প্রুফ লইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখা গেল, গিরিশ বাবু সেইদিন সহসা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। সে অবস্থায় তিনি প্রবন্ধটীর প্রুফ আগাগোড়া না দেখিলেও স্থান বিশেষে শুনিয়াছিলেন। হায়,—তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তাঁহার সহিত সেই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাতে পরিণত হইবে!

সেদিনকার জ্বরে কেহই বিপদের আশঙ্কা করে নাই। কিন্তু ২৫শে

মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। চিকিৎসায় যাহা সম্ভব, তাহার ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু কে মহাকালকে পরাজিত করিতে পারে? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! মানুষের চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইল। মহাকাল বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ রত্ন হরণ করিয়া লইল।

মৃত্যুশয্যায় গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার 'গণা দিন' যে ফুরাইয়া আসিয়াছে—তিনি যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এইবার শেষ! ক্রমে হৃদগতি শিথিল হইয়া আসিল। রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় সব শেষ হইল! ভক্ত গিরিশচন্দ্র—মহাসাধক গিরিশচন্দ্র পার্থিব দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চিরবিশ্রাম—চিরশান্তি—চিরনির্ব্বৃতি—চিরজীবনের কাম্যফল লাভ করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবন-পথের পান্থশালা—বাগবাজারের আবাস-ভবন শোকের উচ্ছ্বাসে ও হাহাকারে পূর্ণ হইল। বিষাদের শোকের ছায়ায় বাগবাজার অন্ধকার হইল। বাঙ্গালার উজ্জ্বল 'দেউটী' নিভিয়া গেল।

যাহা গেল,—বাঙ্গালায় তাহার তুলনা নাই। যাহা হারাইয়াছি, আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। নিয়তির বিচিত্র লীলা! কে তাহার অমোঘ বিধান খণ্ডন করিতে পারে? সমগ্র বাঙ্গালা অন্ধকার করিয়া গিরিশচন্দ্র নিয়মিত বিধানে যে লোকে প্রস্থান করিয়াছেন, সে লোকে তিনি অক্ষয় পুণ্যের ফল ও বিমল শান্তি ভোগ করুন।

শ্মশান-যাত্রা।

প্রত্যূষেই এই সংবাদ কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সর্ব্বত্র এই শোচনীয় সংবাদ ঘোষিত হইল। সহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তগণ,

জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বরবপু সুরভি চন্দনে চর্চ্চিত ও সুগন্ধি পুষ্পে ভূষিত হইল। তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট ও বক্ষস্থলে চন্দনাক্ষরে ইষ্ট দেবতা রামকৃষ্ণের পুতপবিত্র নাম লিখিত হইল। সমবেত জনসাধারণ তাঁহার শেষ মূর্ত্তি দেখিয়া লইলেন। মুখে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়া! মৃত্যু যেন সে মুখের সৌম্য ছবি, প্রসন্নভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র যেন ধ্যানে মগ্ন! চন্দন-চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাটে নবোদিত সূর্য্যের সুবর্ণ-রশ্মি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রশান্ত নয়নে প্রতিভার সে চিরপরিচিত দীপ্তি কই? আনন্দময় সহৃদয় মহাপুরুষ সুপ্তি-সুখে মগ্ন,—সেই স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী গিরিশ-চন্দ্রের সাদর সম্ভাষণ আজ চিরনীরব! মহাকাল! তোমার কি অনন্ত লীলা।

বেলা আটটার সময় গিরিশচন্দ্রের প্রাণশূন্য দেহ শ্মশানে—কাশী-মিত্রের ঘাটে নীত হইল। সমবেত জনগণ শ্মশানযাত্রীর সঙ্গী হইলেন। রোদনের রোলে সহর-পল্লী প্রতিধ্বনিত হইল। গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন, অনুচর, সহচর, কর্ম্মচারী ও দাস দাসীর অশ্রুজলে গিরিশচন্দ্রের মধুর প্রকৃতির প্রভাব পরিস্ফুট হইল।

শ্মশানেও লোকারণ্য হইয়াছিল। ক্রমাগত শ্মশানে জনসমাগম হইতে লাগিল। গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ে শ্মশানঘাট সন্নিহিত রাজপথ পথিকের অগম্য হইয়া উঠিল।

গঙ্গাতীরে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় গিরিশচন্দ্রের বরবপু ভস্মসাৎ হইল। হায়! যে মস্তিষ্ক হইতে এক একটি অমূল্য কোহীনুরসম শতাধিক গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছিল,—সেই মহান মস্তিষ্ক চিতার অনলে ভস্মে পরিণত হইল!

কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ—যাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর প্রাণের অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইত—সেই কলকণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হইল! বাঙ্গালার বাঁশী গিরিশচন্দ্রের চিতায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত দগ্ধ হইল। সে 'অতি অনুপম' বাঁশির মধুর স্বর আর কি বাঙ্গালীর শ্রুতিস্পর্শ করিবে? পুরাতনের সুর মথিত করিয়া আর কি গিরিশের বাঁশরি-ঝঙ্কার বাঙ্গালার বক্ষে ঝঙ্কৃত হইবে?

মধুসূদনের ভাষায়—

"বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে"

সকলে গৃহে ফিরিলেন। সে দিন জাহ্নবীস্রোতে যে রত্নের ভস্মাবশেষ মিশিয়াছে,—বাঙ্গলার ভাগ্যে আর কখনও তেমন রত্নলাভ ঘটিবে কি?

নটগুরু! তুমি আজ স্বার্থদ্বেষবিজড়িত নশ্বর জগতের সংস্রব ত্যাগ করিয়া দিব্যধামের পথিক,—তাই আজ তোমার জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ সমবেদনায় অধীর হইয়াছে, তোমার বিয়োগে সপ্তকোটী বাঙ্গালীর কণ্ঠ হইতে শোকের উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইতেছে! আজ মৃত্যু তোমাকে ভারতের পুণ্যভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তাই আজ আমরা তোমার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছি! তুমি যে বাঙ্গালীর হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলে,—তোমার বিয়োগে আজ আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এতদিন পারি নাই! আজ আমরা তোমাকে অনন্ত কালসাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছি; কিন্তু পরলোক বিশ্বাসী হিন্দু আমরা—আমাদের মনে হয়,—তোমার বুঝি বিনাশ নাই! তোমার আত্মা অবিনশ্বর, তোমার আত্মার বাণী অমর, চিরন্তন, শাশ্বত। ভাবের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। মৃত্যু তোমাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু হরণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গলার চক্ষে—

বাঙ্গালীর চক্ষের উপর তোমার ভাবে তুমি চিরদিন চিরদেদীপ্যমান থাকিবে! তোমার সম্বন্ধ ভুলিবার নয়।

নাট্যশালার জন্মদাতা! তোমার নাট্যাচার্য্য নাম সার্থক হইয়াছে; তোমার সাধনা সিদ্ধির সুবর্ণ আবরণে মণ্ডিত হইয়াছে। তুমি বাঙ্গলায় যে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছ,—কর্ম্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালীকে তৃপ্তি, তুষ্টি, শান্তি ও আনন্দভোগের যে অক্ষয় ভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়াছ, বাঙ্গলার নাট্যশালাশিখরে যে হিরণ্ময় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছ,. যার প্রসাদে তাহা যুগযুগান্তর অটুট থাকুক, তাহা কখনও যেন বিলুপ্ত না হয়। তুমি যে মহাশিক্ষায় বাঙ্গালীর উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়কে দীক্ষিত করিয়াছ,—তাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ে জ্ঞানময়, শিক্ষাময় বীজমন্ত্রে উৎকীর্ণ হউক! তুমি যে মহাভাবে সমগ্র বঙ্গ উদ্বেলিত উচ্ছাসিত অনুপ্রাণিত করিয়াছ,—বাঙ্গলার নাট্য-শালার সমস্ত বিদ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা ধৌত বিলুপ্ত বিধ্বস্ত করিয়া—সেই মহাভাবের উচ্ছ্বাস সমগ্র নাট্যজগৎ প্লাবিত করুক,—নটনাথের নিকট ইহাই আমাদের কামনা!
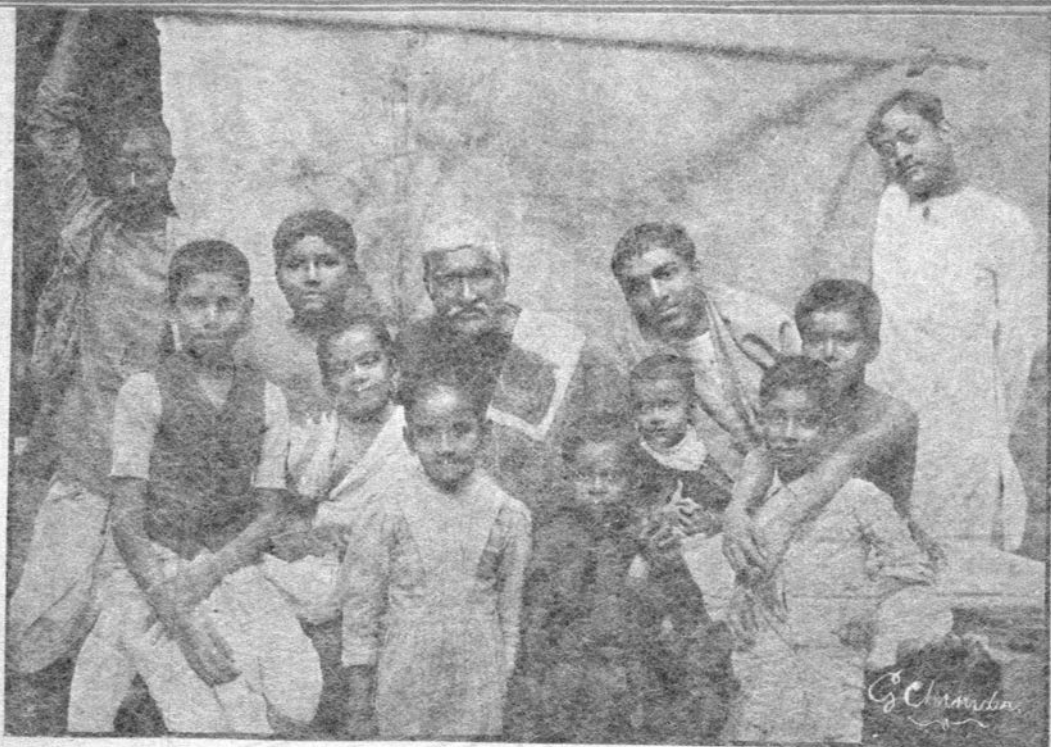
পৌত্র পরিজন পরিবৃত
কবিবর মনোমোহন বসু।

কবিবর মনোমোহন বসু।

(সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী)

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু লিখিত)

সন ১২২৮ সালের আষাঢ় মাসে বুধবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলীয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। কবিবরের বাল্যজীবন যশোহর জেলার অন্তঃপাতি "নিশ্চিন্তপুর" নামক গ্রামে মাতামহ আশ্রমে স্থাপিত হয়, তথায় পঞ্চম বৎসরের শিশু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে "সর্দ্দার পড়ো" রূপে সমবয়স্ক এবং নিজাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে পাঠশালার পাঠ পড়াইয়া গুরুমহাশয়কে সাহায্য করিতেন। শুনিয়াছি সেই অল্পবয়সেই তিনি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতার ফরমাইসমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার দ্বারা তাঁহাদের মন হরণ করিতেন। গ্রামবাসীরা অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশুর মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া শিশুমুখনিসৃত অর্দ্ধো-চ্চারিত রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি গাথা পরম আনন্দ ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতেন। দুইজন অগ্রজের সহিত স্বভাবকবি সানন্দে ও সুস্থদেহে পাঠশালার অধ্যয়ন ও গ্রাম্য খেলাধুলায় বাল্যজীবন অতি-বাহিত করিতেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহোদরত্রয়ের প্রতি অপরের ভক্তি ও ভালবাসার প্রগাঢ়তা দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই বিমোহিত হইতেন। পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে তিনি জননীর সহিত নিজ জন্মভূমি ছোট জাগুলিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কবিবরের ছাত্রজীবন অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তখনকার শিক্ষা-প্রণালীর প্রসারতার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও তিনি আপন কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ

করনার্থে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর চিরসুহৃদ প্রাতঃস্মরণীয় মিঃ হেয়ার ও মিঃ রিচার্ডসন্ সাহেবের নিকট তিনি Hare Schoolএ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় General Assembley's Institutionএর প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁহার ছাত্র-জীবনে একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল; নিম্নে তাহার বিবৃত করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয়ে এইরূপ ঘোষণা হইল যে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রমণ্ডলী হইতে যে কোন ছাত্র কোন একটী নির্ব্বাচিত বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটী মূল্যবান স্বর্ণ পদক ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। অপর একটী উচ্চশ্রেণীর বালক সেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিবেন, কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলী হইতে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু তাহাতে বিচারের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় পরীক্ষকমণ্ডলী যুবা মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পুনর্ব্বিচারের ভার কাহার হস্তে দিলে সন্তোষলাভ কর?" উভয় পক্ষীয় প্রবন্ধ লেখক যুবকদ্বয়ের সহপাঠীগণ বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর রেভারেণ্ড কৃষ্ণবন্দ্যো মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিলেন।

কিছুদিন পরে যুবক মনোমোহন একদিন বিদ্যালয়ের বারাণ্ডায় পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন যে "করিলাম কি—যদি পরাস্ত হই তাহা হইলে এ স্কুলে আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব"। উচ্চকাঙ্খী যুবকের প্রাণের গভীর আবেগ যেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার ওগিল্‌ভি (Dr, Ogilvie) বুঝিতে পারিয়াই ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করতঃ কহিলেন "Well Mohun!

here is the result. I see you stand first"। (অর্থাৎ—"মোহন! পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে—তুমি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছ!") চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

মোট কথা Rev. মহাশয় অভিমত জ্ঞাপনে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "মনোমোহন বাবু নামক যুবকের প্রবন্ধ অতিসুন্দর হইয়াছে কারণ এই প্রবন্ধে বাজে অসার কথা নাই; সহজ বোধগম্য ও প্রচলিত শব্দবিন্যাসে আমি এই প্রবন্ধটীকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিলাম।" অতঃপর নির্ব্বাচিত দিবসে কর্ত্তৃপক্ষ ও পরীক্ষকমণ্ডলী টাউনহলে সমবেত নিমন্ত্রিত বিদ্বজ্জন ও দেশস্থ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সেই মূল্যবান স্বর্ণ পদক খানি ও নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি প্রদানান্তর উৎসাহিত করিলেন। উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে এক খানির নাম স্মরণ আছে—Walker's Dictionary.

কবিবরের খুল্লতাত ৺ চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় ছোট জাগুলীয়া গ্রামের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছোট জাগুলীয়াস্থ বাস ভবনে সর্ব্বদাই নানাবিধ ক্রিয়া কলাপ হইত; কবিবর অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়েন। বৃদ্ধ খুল্লতাত মহাশয় অপুত্রক নিবন্ধন কবিবরও তাঁহার সহোদরগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন। পরস্পর ভ্রাতাগণের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব ছিল যে তাহা একালে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। যুবককে বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও সঙ্গীতাদি রচনাপ্রিয় দেখিয়া বৃদ্ধ খুল্লতাত প্রথমে তত উৎসাহ প্রদান করেন নাই; কিন্তু ক্রমে যুবকের চতুর্দ্দিকে সুযশ শুনিয়া ও রচনাচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সাহিত্যসেবা কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিলেন।

তাহার পর হইতেই তিনি নির্ভয়ে সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতাদি

রচনার সুবিধা পাইলেন। আবার সেই সময়ে সরস্বতীর বরপুত্র স্বর্গগত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্য-সম্রাট অক্ষয়কুমার দত্ত, ঋষিকল্প মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বনামধন্য চিরস্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়গণের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন। তিনি এই সুযোগে সংবাদপত্র "প্রভাকর" ও "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল; গুপ্ত কবি যুবক মনোমোহনের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রিয় শিষ্যরূপে আলিঙ্গন করিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে কবিবর স্বয়ং "বিভাকর" নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন।

ইহার মধ্যে আর একটী অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় কবিবরের সাহিত্য জগতে উন্নতির পথ আরও সুপরিষ্কৃত হইল। তাঁহার আবাল্য সখা, সম্পর্কে শ্যালক, পরে কলিকাতার প্রথিতনামা Ernsthushan Oysterler কোম্পানীর book keeper ৺ক্ষেত্র-মোহন মিত্রের সহিত বালকোচিত চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া ৺কাশী-ধামে যাত্রার সুযোগ উপস্থিত হইল। আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তখন কেবলমাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে; তাহার পর বরাবর গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। সেকালে তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইলে লোকে বাটী হইতে উইল করিয়া যাত্রা করিত। তাঁহারা সে সমস্ত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতঃ ৺বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে বাঙ্গালীটোলায় ৺ গুপ্ত কবির তখন খুব পসার। ৺গুপ্ত কবিকে পাইয়া তথাকার বাঙ্গালীরা একেবারে একটী সঙ্গীতসংগ্রামের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু ৺গুপ্ত কবির সহিত প্রতিযোগীতা সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে কেহই সাহসী হইলেন না। মনোমোহনকে পূর্ব্ব হইতেই ৺গুপ্ত কবি প্রিয় শিষ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সেই সংগ্রামের দুই

একটী বিশিষ্ট পাণ্ডাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে আমার এক প্রিয় শিষ্য ৺ ধামে সমুপস্থিত। তোমরা তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারিলে আমার কোন আপত্তি নাই। সেই সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মনোমোহন প্রথমেই এ প্রস্তাব শ্রবণে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সখা ৺ ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের অকাট্য যুক্তি ও উৎসাহজনক প্ররোচনায় পরিশেষে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষেরই মহলা খুব জোরে চলিতে লাগিল; আসর খুব জমকাল হইল; বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জন সংঘে সংগ্রাম ক্ষেত্রের শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। গান বাজনা তখনকার দিনে যতদূর সম্ভব সুচারু-রূপে গঠিত হইল। পরিশেষে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ৺ গুপ্ত কবি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় প্রিয় শিষ্যের হস্তে পরাস্ত স্বীকার করিলেন; কবি মনোমোহন তখন গলদ্বর্ম্ম কপোলে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই বিস্তীর্ণ সংগ্রাম ক্ষেত্রে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ৺ গুপ্ত কবি সাদরে বিনম্র যুবকের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "আমার আশীর্ব্বাদে তুমি প্রতি সঙ্গীতসংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়ী হও।" অমর কবির এ ভবিষ্যৎ বাণী অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সফল হইয়াছিল কিনা তাহা সহৃদয় বঙ্গবাসী পাঠক পাঠিকা মাত্রেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। যদি কাহারও এ কথায় আস্থা স্থাপনে বিলম্ব ঘটে, আমরা তাঁহাদের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর স্বনামধন্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত "মনোমোহন গীতাবলী" অন্ততঃ একবারও পাঠ করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। সেই গীতাবলীর মধ্যে পাঠক পাঠিকা আরও দেখিবেন যে, যে স্বদেশী আন্দোলন সমুত্থিত হইয়া এখন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পুণ্য ভারতভূমি আন্দোলিত,—সেই পবিত্র স্বদেশী ব্রত পালনের

কি সুন্দর যুক্তি তর্ক আক্ষেপ, উৎসাহবাণী, স্বদেশের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্যতা, ও ধৈর্য্যতাসহ কর্ত্তব্যপালন ইত্যাদির পূর্ব্বাভাষ পূর্ব্ব-সঙ্কেতরূপ পূতবীজ কত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে প্রোথিত ও সন্নিহিত রহিয়াছে! বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ অবৈতনিক নাট্যশালার জন্য লিখিত ও অভিনীত অমর কবির "হরিশ্চন্দ্র" নামক পৌরাণিক নাটকে যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে সেই দেশ বিখ্যাত সঙ্গীত "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" বাহির হইয়াছে তাঁহার স্বদেশ ভক্তি সম্বন্ধে অধিক পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র!

অমর কবির নিজ গ্রাম ছোট জাগুলিয়া তখন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত। গ্রামখানিকে তখনকার কালে লোকে আদর্শ গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। গ্রামের মধ্যে প্রকৃতই যেন স্বায়ত্ত শাসন (self government) প্রথা প্রচলিত। স্কুল, পথ, ঘাট, ঔষধালয়, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত গ্রামবাসীগণের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা,—সকলেরই হৃদয়ে এক প্রাণতা, পূজাপার্ব্বণে, ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতিতে গ্রামখানি আদর্শরূপে রাজপুরুষগণ কর্তৃকও পুনঃ পুনঃ এবং কলিকাতার পত্রিকা প্রভৃতি দৈনিক পত্রে বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদূর উন্নতির পথ যথায় প্রসারিত; তথায় যে একটী অবৈতনিক নাট্যশালা সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি! গ্রামস্থ যুবকবৃন্দ সকলেই তখন উন্নতশীল উপায়ক্ষম এবং সমাজ সংস্কারক ব্রতে দীক্ষিত। কবিবর সেই দলের একজন নায়ক বিশেষ। তাঁহার কবিতা রচনার ক্ষমতাও তখন প্রখর। সুতরাং একখানি নাটক রচনার ভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত হইল। কবিবর কবিগুরু বাল্মীকির সপ্তকাণ্ডময় কল্প পাদপ যাহা ভারতবর্ষীয় কাব্য কাননের বীজবৃক্ষ স্বরূপ, তাহারি একটী পল্লব মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "রামাভিষেক" নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নাটক রচনা সমাপ্ত হইল; সকলে পাঠে অত্যন্ত আনন্দ

অনুভব করিলেন। "রামাভিষেক" নাটক সম্বন্ধে ১২৭৪ সালের "প্রভাকর", "সোম প্রকাশ", "এডুকেশন গেজেট", "ভারত রঞ্জন", "ঢাকা প্রকাশ" ইত্যাদি বহু সংবাদপত্র আপন মতামত প্রকাশ করিলেন; মোট কথা সকলে একবাক্যে এতদূর উচ্চ প্রশংসা করিলেন যে, গ্রন্থকার স্বয়ং তখন বুঝিতে পারিলেন যে নাটকখানি অতি উচ্চ দরের হইয়াছে। বস্তুতঃই তখনকার অধিকাংশ নাটকেই স্থান বিশেষে অতি জঘন্য ভাবে অঙ্কিত হইত। সুতরাং তদ্যাবৎ গ্রন্থ সকল স্ত্রীলোকের পাঠের পক্ষে উপযোগী হইত না। কিন্তু মনোমোহন বাবু অশ্লীল বিষয়ের সমাবেশ ভিন্ন ও যে হাস্য রসের উদ্দীপন করা যায় তাহা প্রমাণিত করিয়া ও সে রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নাটকখানিকে অতি মনোহর করিয়াছেন ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন। স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি না থাকিলে নাটক লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রজাবাৎসল্য, রাজভক্তি, পিতামাতা ও পুত্রের পরস্পর স্নেহ-ভক্তি, দাসীদিগের কপট ও নিষ্ঠুরাচার নিবন্ধন পুরস্ত্রীগণের মত পরিবর্ত্তন, বহুবিবাহ মৃত্যুর কারণ, ভ্রাতৃস্নেহ, জ্যেষ্ঠের প্রতি অকপট ভক্তি, দাম্পত্য-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রভৃতির নিমিত্ত রামাভিষেক নাটক যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

নাটকখানি ছোট জাগুলিয়া গ্রামে অভিনীত হয় নাই; সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সংগৃহীত অর্থ তদর্থে ব্যয়িত হইয়া কত অভাগার অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার কারণ হইয়াছিল। তৎপরে নাটকের সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবামাত্র বঙ্গের শত শত গ্রামে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সুবিখ্যাত বহুবাজারস্থ গুণ প্রবীণ নাট্যাভিনয়সমাজ যেরূপ সুপদ্ধতি ও নিপুণতা সহকারে ইহার ও গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী নাটকদ্বয়ের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন

সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়ই পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাটকখানির পুনর্মুদ্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। শুনিয়াছি প্রথম সংস্করণ অবশিষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় পুস্তক বিক্রেতারা প্রতি খণ্ড ২৲ টাকা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল।

মনোমোহন বাল্যকাল হইতে স্পষ্টবাদী নির্ভীকচেতা ও স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন; পরের দাসত্ব তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবপর নয়। কলিকাতাস্থ কোন প্রসিদ্ধ হাউসের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে কুসুম ফুল খরিদ জন্য ঢাকা সহরে যাইতে হইয়াছিল। সেইখানে কর্ম্মসূত্রে অবস্থিতিকালীন তিনি তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম "প্রণয় পরীক্ষা নাটক" রচনা করেন। প্রণয় পরীক্ষা নাটক অতি দক্ষতার সহিত সুবিখ্যাত "ষ্টার থিয়েটারে" বহুবার অভিনীত হয়। ইং ১৮৭০ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় কবিবরের পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনাকালে উভয় পুস্তকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে "বঙ্গদেশে এতদিন পরে স্ত্রী পাঠ্য নাটকের অভাব মোচিত হইল। প্রণয় পরীক্ষা প্রথম হইতে উৎকৃষ্টতর; কারণ ইহা গ্রন্থকারের স্বকপোল কল্পিত চিন্তাদেবীর সাহায্যে লিখিত; কোনরূপ সাহায্য গল্পের ভিত্তিস্বরূপ কোনস্থান হইতে আহরণ না করিয়া তিনি পুস্তকখানিকে এরূপ শিক্ষাপ্রদ সুরঞ্জিত ও বহুবিবাহের অনর্থ সমর্থিত করিয়াছেন যে পাঠ করিলে যুগপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়।" তৎপরে তিনি স্কুলের সহজ পাঠ্যের অভাব বিমোচনার্থ "পদ্যমালা" প্রণয়ণ করেন।

আধুনিক উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের নিকট "পদ্যমালার" পরিচয় প্রদান নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করি। বাঙ্গালী জাতির নিকট বংশ পরম্পরায় এই পাঠ্য পুস্তক যে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগৃহীত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি! ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত, তাহার

উপর মধ্যে মধ্যে কাব্যরসাভিষিক্ত থাকায় প্রকৃতই প্রত্যেক বঙ্গ বালকের কণ্ঠে ইহা অমূল্য কণ্ঠহার স্বরূপ। গ্রন্থকার ইহার ২য় ও ৩য় ভাগও প্রণয়ণ করিয়াছিলেন।

মনোমোহনের বহুস্থলের বিস্তৃত বক্তৃতাগুলি সঙ্কলিত হইয়া বক্তৃতা-মালা নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। নবীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে যাঁহারা মোহাভিভূতের স্থায় হিন্দু আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন তাঁহারা তাঁহার "হিন্দু আচার ব্যবহার" নামীয় বক্তৃতাটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে কি অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে তিনি হিন্দু সমাজ হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল, সময়োচিত দোষ গুণের বিচার অপক্ষপাতে প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে নানা রসের অবতারণা পূর্ব্বক শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; সভাপ্রাঙ্গনে বক্তারূপে তিনি দণ্ডায়মান হইলেই বিশাল শ্রোতৃবৃন্দ অমনি আনন্দে উৎ-ফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভাণ্ডারে সুমিষ্ট বিজ্ঞজনোচিত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝরিণী সর্ব্বদা সংরক্ষিত থাকিত। গ্রন্থকারের "সতীনাটক" বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। বহুকালের পুরাতন উপাদান দ্বারা যে এরূপ অভিনব প্রণালীর দৃশ্যকাব্য সজীবরূপে প্রবর্ত্তিত হয় মনোমোহনই তাহার প্রথম পথ প্রদর্শক। সতীনাটকের ভাষা ও রচনা-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বধর্ম্মানুরাগ, শিবের শিবত্ব, নারদের চরিত্র, সতীর পাতিব্রতা, দক্ষের রাজপদগৌরব, ভগিনীগণের সহোদরার প্রতি স্নেহ, ঈর্ষ্যা ও আত্মগৌরব, প্রসূতির কন্যাবাৎসল্য, শাস্তিরামের বিকারশূন্য 'ইষ্ট' সিদ্ধি সমূহ এরূপ পরিপাটী-রূপে চিত্রিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া অতীত যুগের সজীব চিত্রাবলী সম্মুখে প্রতিফলিত হইতে থাকে। সতীনাটকে প্রসূতি প্রাণ-নন্দিনী সতীর আত্মহুরবস্থায় সন্তোষ ও গৌরব জ্ঞান

সুখে দুঃখে সমভাব, পতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং পিতা কর্তৃক পতি নিন্দা শ্রবণে পিতৃদত্ত আত্মদেহ বলিদান দ্বারা শান্তি স্থাপনের গূঢ় তাৎপর্য্য ইত্যাদি এত সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার তুলনা সম্ভবপর নহে। সর্ব্বোপরি সতী নাটকের শান্তেপাগলা গ্রন্থকারের ও বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব, উপাদেয় ও সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ সংসার-উদাসীন ও সাধু চরিত্র অঙ্কন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

বহুবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রন্থকার "সতী" ও "হরিশ্চন্দ্র" নাটক প্রণয়ণ করেন। উভয় গ্রন্থই তাঁহারা অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তিনি একটী চিত্ত বিনোদন নাট্যশালা স্থাপনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই অভিনয় দর্শনার্থ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত সহরবাসীগণ অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক রঙ্গালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকারের টিকিটের আবেদনের সংখ্যা সময়ে সময়ে এত অধিক হইত যে নাট্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ সকলের অনুরোধ সকল সময়ে রক্ষা করিতে না পারিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইতেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলি পুরুষের দ্বারা অভিনীত হইত বটে; কিন্তু এত স্বাভাবিক হইত যে কোনরূপ ত্রুটী বা ভ্রম পরিলক্ষিত হইত না। অভিনয়, গান, ঐক্যতান বাদন অতি সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহ হইত।

১২৮১ সালের পৌষ মাসে কবিবর "হরিশ্চন্দ্র" নাটক প্রণয়ণ করেন। এই পৌরাণিক গ্রন্থখানি নাটকীয় বহু সৌন্দর্য্যের আধার; ইহার এক দিকে গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যগুণে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই— যেন গম্ভীরতর চিন্তাসরোবরে প্রাচীন আর্য্যদিগের মানসহংস মহানন্দে কেলি করিতেছে; তাহারই মধ্যে তাঁহারা পরিদৃশ্যমান নিসর্গের, কি

অতীন্দ্রিয় মানবমনের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া কাব্য পুরাণাদিতে চিত্রিত করিতেন—আহা! সেই শক্তি বিচ্যুত হইয়া আধুনিক আর্য্যসন্তানগণ সেই মহাপুরুষগণের বর্ণিত ব্যাপার আর বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না—বিমূঢ় মানসে সকল অলীক প্রলাপবৎ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু মনোমোহনের মোহন তুলিকায় সেই প্রাচীন তত্ত্বের বিস্তারছায়া কিঞ্চিৎ মাত্র প্রতিফলিত হওয়ায় নাটকীয় চরিত্র অঙ্কন পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের গভীর গবেষণার ফলেই তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র একটা কিন্তুতাকার নাস্তিক দুর্দ্দান্তরূপে বাহির না হইয়া বিশ্বসংসারের পরম মিত্র ব্রহ্মর্ষিরূপেই প্রতিভাসিত হইয়াছেন। মনোমোহন মানবমনের গূঢ়তম তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার "কমলার" সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলা সাক্ষাৎ প্রীতিরূপিণী মানবদেহ ধারিণী দেবী প্রতিমা। প্রতিদান পাইলে ভালবাসি, এ কথা তিনি বলেন না। "আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমার" এ কথাও তিনি বুঝেন না। "আমি যাহাকে ভালবাসি,—সে আর আমি এক আমাতে তাহাতে ভেদ নাই; সে যাহা আমি তাহা"—এই মহাদেবী এই মন্ত্রে দীক্ষিতা। এরূপ পবিত্র সূক্ষ্মতম মনোভাবকে মূর্ত্তিমান করিবার শক্তি মনোমোহনের তুলিকায় সম্ভবপর; নচেৎ আধুনিক বিজাতীয় ভাবাপন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে এ চিত্র একান্ত দুষ্প্রাপ্য। বস্তুতঃই কবির "কমলার" অলৌকিক প্রেমচিত্র অঙ্কন এক অপূর্ব্ব হৃদয় দ্রবময়ী চিত্রপট বিশেষ। সকল চরিত্রে সমালোচনার স্থান সমাবেশ এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মপ্রাণ সত্যব্রত রাজা হরিশ্চন্দ্র ও ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা শৈব্যা রাণী সত্য পালনের জন্য যে কতদূর স্বার্থ বিসর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকার যেরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থকার "পার্থ পরাজয়" ও "আনন্দময়" নাটক তৎপরে

প্রণয়ণ করেন। ১২৯৬ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ অন্ত একখানি "রাসলীলা" নামক গীতিনাট্য প্রণয়ণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে যাহারা পৌরাণিক কল্পনার পুষ্প কাননে প্রবেশ করিয়া অটল ঋষিদিগের নির্ম্মাল্য পুষ্পে নাটক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে মনো-মোহনের স্থান যে অতি উচ্চে অবস্থিত, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া মনোমোহন এক সুবৃহৎ "দুলীন" নামক ঐতিহাসিক নবন্যাস রচনা করেন। উপন্যাস মধ্যে নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন এতদূর সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত হইয়াছে যে গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। একেতো বিষয়টী অতি গুরুতর ও উত্তেজক রাজকীয় সমস্যায় পূর্ণ, তাহার উপর নবন্যাসোচিত নানা চরিত্র সমাবেশে পাঠকের পাঠের একান্ত উপযোগী হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিবার লোভ সম্বরণ বড় দুরূহ।

এই প্রবন্ধে হাফ আখড়াই, পাঁচালি, কবি প্রভৃতির গান সম্বন্ধে লিখিবার সুবিধা ও সময় না পাওয়ায় লিখিত হইল না। বারান্তরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত।

জন্ম ও শৈশব-কাহিনী।

১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন সোমবার কলিকাতা বাগবাজারের বসু পাড়ায় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশ-চন্দ্রের পিতার নাম ৺ নীলকমল ঘোষ; তিনি সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভব—বাগবাজারের অধিবাসী। গিরিশচন্দ্র পিতার মধ্যম পুত্র, জননীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। হিন্দুর বিশ্বাস—অষ্টমগর্ভজাত সন্তান সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ স্বনাম-খ্যাত সর্ব্ববিশ্রুতকীর্ত্তি হইয়া থাকেন; এই বিশ্বাসবলে অষ্টমগর্ভজাত সন্তান—পিতামাতার অত্যধিক প্রিয় হয়। গিরিশচন্দ্রের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি পিতামাতার বড়ই আদরের সন্তান হন। গিরিশচন্দ্র অতি শুভদিন ও শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। যে দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি; শুক্লপক্ষের অমল ধবল চন্দ্রের কিরণস্নাত হইয়া বঙ্গ-চন্দ্র গিরিশচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পিতা একজন প্রসিদ্ধ, 'বুক কিপার' ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতকগুলি ভগিনী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভগিনীগুলির মধ্যে অনেকেই শৈশবে লোকান্তরিতা হয়। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া গিরিশচন্দ্র যখন ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ গমন করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। প্রথমে গিরিশচন্দ্র গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন।

অষ্টমবর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র ভীষণ ভ্রাতৃশোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার স্নেহময় অগ্রজ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া, অনুজের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্রের শিশুহৃদয়ে ভাবের বিকাশ হইয়াছিল। শৈশবে ভাব-বিকাশ। শৈশব হইতেই তিনি গান ও কবিতা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। রাস্তা দিয়া কোন ভিখারী গাহিয়া গেলে, তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে গিরিশচন্দ্র তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠে তাঁহার আগ্রহের সীমা থাকিত না; তিনি অতি শৈশবেই রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার খুল্লপিতামহীর নিকট রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-বর্ণিত আখ্যাগুলি নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেন। পুরাণের গল্প শুনিতে পাইলে, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। পুরাণের গল্প শুনিবার সময় নানা ভাবে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিত। গল্প শুনিতে শুনিতে যখন তাঁহার মনে সন্দেহ উঠিত, তখন তিনি সে সম্বন্ধে পিতামহীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতেন।

একদিন গল্প করিতে করিতে পিতামহী বলিলেন,—"কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন।"

বালক গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার আসিলেন ?"

পিতামহী বলিলেন,—"না।"

গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর আসিবেন না ?"

পিতামহী বলিলেন,—"না।"

গিরিশচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে তিনবার এই প্রশ্ন করিলে, উত্তরে তিন বারই শুনিলেন,—"না।" তাঁহার কোমলপ্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাহার পর পিতামহীর নিকট হইতে পলাইয়া গেলেন। ইহার পর তিন দিন আর তিনি গল্প শুনিতে আসেন নাই। কোথাও কবি, যাত্রা বা হাফ-আখড়াই হইলে, বালক গিরিশচন্দ্র সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন, নিবিষ্টচিত্তে শেষ পর্য্যন্ত শুনিতেন। এই হাফ-আখড়াই হইতেই গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে কাব্য-রস-বিকাশের সূত্রপাত হয়; এই উপলক্ষেই তাঁহার অন্তরে কবি হইবার বাসনা অঙ্কুরিত হয়।

শৈশবের আকাঙ্ক্ষা।

বাগবাজারের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী স্বর্গীয় ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে একদিন হাফ-আকড়াই উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছে। আকড়াই স্থলে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছে; নিমন্ত্রিত গণ্য মান্য বরেণ্য ব্যক্তিগণকে অতি কষ্টে পথ করিয়া লইয়া জনতা ভেদ করিয়া আসরে গিয়া বসিতে হইতেছে,—এমন সময় সামান্য পরিচ্ছদধারী জনৈক ভদ্রলোক দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার আগমনে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল হর্ষকোলাহল ও অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল। জনতা আপনা আপনি অপসারিত হইয়া তাঁহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল, শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসরের মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বালক গিরিশ-চন্দ্রও পূর্ব্ব হইতেই এই আসরে আসিয়া আকড়াই শুনিতে বসিয়া-ছিলেন। সামান্য পরিচ্ছদধারী নবাগত ব্যক্তির এই প্রকার মহা অভ্যর্থনা দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখনই তিনি জানিতে পারিলেন—আগন্তুক কবিবর

ঈশ্বরগুপ্ত। কবির এইপ্রকার খাতির দেখিয়া বালক গিরিশচন্দ্রের মনে মনে কবি হইবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পরই তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত "প্রভাকরের" গ্রাহক হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে প্রায়ই কবিতা রচনা করিতেন, বন্ধুবান্ধবদিগকে শুনাইতেন, তাহার পর আবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন।

গিরিশচন্দ্র যখন একাদশ বৎসরের বালক, তখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করেন; ইহার তিন বৎসর পরে চতুর্দ্দশবৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র পিতৃহীন হইলেন। বালক গিরিশচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরেই অভিভাবক শূন্য হইলেন। মাথার উপর রহিলেন একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী; তিনিই বালক গিরিশচন্দ্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন বালকের ভগিনীর নিকট ভৎর্সনা অপেক্ষা আদরই অধিক ছিল। এইরূপে অভিভাবক শূন্য হইয়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া, সপ্তদশবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতেই গিরিশচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের উত্তেজনায়, বিশেষতঃ তাঁহার পরম বন্ধু সবজজ ৺ ব্রজবিহারী সোমের প্ররোচনায় তিনি গৃহে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। প্রায় চারি বৎসর গিরিশচন্দ্র গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবারাত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এই কয়েক বৎসর, গ্রন্থই তাঁহার প্রধান সঙ্গী ছিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের অবসাদকালে ইংরাজী কাব্যে পদ্যানুবাদ করিয়া চিত্তস্ফূর্ত্তি করিতেন। বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া এবং "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী"র গ্রাহক হইয়া, অনবরত পরিশ্রমে ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করেন। সেই হইতে তাঁহার অধ্যয়নশীল জীবন শেষজীবন পর্য্যন্ত সমভাবে বহিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াও তাঁহার

পড়িবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি "এসিয়াটীক সোসাইটী"র মেম্বর হইয়াছিলেন।

শৈশব রচনা।

গিরিশ চন্দ্র শৈশব-রচিত কবিতাবলী রক্ষা করিবার কখনও প্রয়াস পান নাই; কবিতা রচনা করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে শুনাইয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন, তাহার পর সে সমস্ত কবিতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। আমাদের মনে আছে, স্বনামধন্য নটকবি শ্রীযুত অমৃতলাল বসু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'গিরিশ বাবু যে সকল কবিতা ও গান বাঁধিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি আমরা যত্ন করিয়া রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে কবি হইয়া যাইতাম।'

গৃহে অধ্যয়নকালে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদ করিতেন। প্রথমে তিনি অবিকল অনুবাদ করিবার প্রয়াস পান, পরে স্বাধীন অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই দুই প্রকারের দুইটি কবিতা ও তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(১) "Pope"এর "Eloisa to Abelard" হইতে—

In these deep solitudes and awful cells,
Where heavenly-pensive contemplation dwells,
And ever-musing melancholy reigns;
What means this tumult in a vestal's veins?

অনুবাদ—

গভীর নিভৃত হেন ভীষণ মন্দিরে,
চিন্তাসতী মূর্ত্তিমতী বিরাজিত ধীরে,
বিহরে বিষাদ যথা ভাবনা মগন;
কেন হেন বিচঞ্চল তপস্বিনী মন?

(২) John Gay"এর "A Ballad" হইতে—

'Twas when the seas where roaring
With hollow blasts of winds ;
A damsel lay deploring,
All on a rock reclined.
Wide o'er the foaming billows
She cast a wistful look ;
Her hand was crown'd with willows,
That trembled o'er the brook.
Twelve months are gone and over,
And nine long tedious days.
Why didst thou, venturous lover,
Why didst thou trust the seas,

অনুবাদ—

দেখাইতে আশুগতি, বেগে চলে আশুগতি,
জলনিধি গরজে ভীষণ ;
সন্তাপিতা একাকিনী, শিলাতলে বিরহিণী,
হেরিলাম শয়নে তখন।
নয়ন-কমলে বারি, ঝরিছে মুকুতা সারি,
বিস্তার জলধি পানে চায় ;
বিবশা বর্জ্জিতা বেশ, আকুল কুঞ্চিত কেশ,
মনোহর উড়িতেছে বায়।
বৎসর হয়েছে পাত, নয় দিন তার সাথ,
প্রাণনাথ এল না আমার ;
কেনহে হৃদয় ধন, করিয়ে দারুণ পণ,
জলনিধি হ'তে গেলে পার।

অবশেষে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মূল অবিকৃত রাখিয়া, অনুদিত ভাষার মাধুর্য্য রক্ষার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়। এই প্রকার রচনার দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল।

"Pope"এর "Indian Lover's Song" হইতে—

Hasten, love, the sun hath set;
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding.

অনুবাদে—

এস প্রিয়ে ত্বরাতরি, ডুবিল তিমির-অরি,
চন্দ্রোদয়ে গোধুলি ভেদিয়ে,
শুভ্র মসজিদের শির, শোভিত রজত নীর,
যায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে।

নীরব সকল রব, নিদ্রিত মানব সব,
বুলবুল পাখী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কয় অনুরাগে।

অবশেষে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মূল অবিকৃত রাখিয়া, অনুদিত ভাষার মাধুর্য্য রক্ষার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়। এই প্রকার রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Pope"এর "Indian Lover's Song" হইতে—

Hasten, love, the sun hath set ;
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose ;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding.

অনুবাদে—

এস প্রিয়ে ত্বরাত্বরি, ডুবিল তিমির-অরি,
চন্দ্রোদয়ে গোধুলি ভেদিয়ে,
শুভ্র মসজিদের শির, শোভিত রজত নীর,
ধায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে।

নীরব সকল রব, নিদ্রিত মানব সব,
বুলবুল পাখী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কয় অনুরাগে।

দূরস্থিত স্রোতস্বতী, মরি মরি করে গতি,
আসে ধনী জিনিয়া সুতান;
সেইরূপ মৃদু রবে, চুম্বন করিছে যবে,
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান।

কুড়ি বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র "অ্যাটকিন্‌সন্ টিলটন্" কোম্পানীর আফিসে শিক্ষানবিশীরূপে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি "আরজেন্টি সিলিজি" কোম্পানির আফিসে সহকারী কেসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি আরও দুই তিনটি আফিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশে গিরিশ বাবুর বিশেষ দক্ষতা ছিল। শেষোক্ত আফিসগুলিতে তিনি বুককিপারের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সওদাগরি আফিসে।

গিরিশ বাবুর বয়স যখন ২৩ বৎসর, তখন তিনি কতকগুলি বন্ধুর সহযোগীতায় বাগবাজারে একটি অবৈতনিক যাত্রা-সম্প্রদায় প্রতিষ্টিত করেন। এই নাট্য-সম্প্রদায়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পৌরাণিক নাটক "শর্ম্মিষ্ঠা" অভিনয়ার্থ মনোনীত হয়। যাত্রা উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ গীত রচয়িতা বাবু প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট গমন করেন; কিন্তু বহু যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একখানিও গীত না পাওয়ায়, গিরিশ বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন,—"এত কষ্ট কেন? আয় আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি!" উভয়ে উৎসাহের সহিত উক্ত যাত্রার গান রচনা করিলেন। উত্তরকালে যিনি শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত গীত এই সময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। পাঠক-গণের কৌতুহল নিবারণার্থ এখানে দুইটী গীত উদ্ধৃত হইল,—

বাগবাজারের অবৈতনিক যাত্রা-সম্প্রদায়।

(১) দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি!—

বেহাগ—একতালা।

(সখি ধর ধর'—সুরে গেয়)

আহা! মরি—মরি!
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী!
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমল-নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
কি ভাবে ভামিনী ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছ এই স্থানে?
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণী-রতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি॥

(২) সখীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা;—

আড়ানা—একতালা।

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনা দহে হিয়ে।

চিত-মোহন, বিনোদ-বদন, আর কি পাব কভু দরশন,
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,
পরশে পূরাব সাধ—
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধ'রে, লুকাল মন হরিয়ে।

পাইকপাড়া রাজবাটীতে যৎকালে মহাসমারোহে রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটকাভিনয় চলিতেছিল, তৎকালে অভিনয় দর্শনার্থে একখানি টিকিট পাইবার জন্য ভদ্রলোকগণ লালায়িত হইতেন, এমন কি যিনি একখানি টিকিট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেন। কিশোরবয়স্ক গিরিশ বাবুর মনে উক্ত রাজবাটীর অভিনয় দর্শন লালসার পরিবর্ত্তে, এরূপ একটী থিয়েটার করিবার বাসনা হইয়াছিল। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার আশায় বরাবর তিনি সুযোগ খুঁজিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে যাত্রা-সম্প্রদায় সংগঠনে তাঁহার মনোরথ-সিদ্ধির উপায় হইল। গিরিশবাবু ৺নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ায় শ্রীযুত অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের আয়োজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার জনকস্বরূপ এই 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের শিক্ষক এবং নেতার পদ গিরিশ বাবুর উপরেই অর্পিত হইল। যৎকালে উক্ত সম্প্রদায় নবোৎসাহে অভিনয় খুলিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফি আসিয়া যোগদান করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৺শারদীয়া পূজার সপ্তমী রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ার ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাটীতে "সধবার একাদশী"র প্রথম অভিনয় হয়।

রঙ্গমঞ্চে নাট্য-প্রতিভা।

সে সময় প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটী লইয়া একটী প্রস্তাবনা

থাকিত, কিন্তু সধবার একাদশীতে তাহা না থাকায়, তৎকাল প্রচলিত প্রথামত গিরিশবাবু নট-নটী লইয়া একটি প্রস্তাবনা এবং আবশ্যকবোধে কয়েকটি গানও রচনা করিয়া দেন। এই নাটকের অভিনয়ে গিরিশ বাবু "নিমচাঁদে"র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজী কাব্য আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকা আবশ্যক। এ নিমিত্ত উক্ত ভূমিকায় অভিনয় সাধারণ অভিনেতার দ্বারা অসম্ভব এইরূপ সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশবাবুর উক্ত উদ্ধৃত ইংরাজী কাব্যের আবৃত্তি শুনিয়া দর্শকবৃন্দ যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"সধবার একাদশী"র সাতবার অভিনয় হয়, তন্মধ্যে চতুর্থ অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্রের শ্যামবাজারের ভবনে এই অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়স্থলে বঙ্গের তৎকালীন গণ্য মান্য বরেণ্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু বাবুও আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে এই অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেন। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধু বাবু গিরিশচন্দ্রের নাট্য-কলা-কুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,— 'তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনীত হইত না; নিমচাঁদ' যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বঙ্গগৌরব শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ মিত্র মহোদয় উক্ত রাত্রির অভিনয় দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছিলেন,—"নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। * * * সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধহয় কখনও ভুলিব না। * * * অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। অনতিবিলম্বেই গিরিশ-

বাবুর সহিত সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু।"

"সধবার একাদশী" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশবাবু দীনবন্ধু বাবুর "বিয়ে পাগলা বুড়ো" প্রহসনেরও অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চোরবাগানের প্রসিদ্ধ ধনী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) মহাশয়ের ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। 'সধবার একাদশী'র পর প্রহসনের অভিনয় হয়। গিরিশবাবু নিমচাঁদ বেশে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র প্রস্তাবনা স্বরূপ মুখে মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং।
বাসর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং॥
আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ রসিকমণ্ডল॥
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার ফুরালো আমার কথা॥

বাগবাজারে যাত্রা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়,—ইহাই গিরিশ বাবুর নাট্যকলার প্রথম সূচনা, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাত্রা সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া থিয়েটার-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেও, যাত্রা-সম্প্রদায়টির অস্তিত্ব লোপ পায় নাই, উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয় করিতেছিলেন। গিরিশবাবু যখন "সধবার একাদশী" অভিনয় করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিলেন, তখন যাত্রা-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—"থিয়েটার করিয়া সুখ্যাতি পাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু যাত্রা করিয়া খ্যাতি লাভ করা বড়ই কঠিন কথা।" একথা গিরিশ বাবুর শ্রুতিস্পর্শ করিল; যৌবন-

যাত্রার প্রতিষ্ঠা।

সুলভ উত্তেজনা-বশে গিরিশবাবু বলিলেন,—"আটদিনের মধ্যেই তোমাদিগকে যাত্রা শুনাইয়া দিব।"—যেমন কথা, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কার্য্যারম্ভ। সেই রাত্রেই গিরিশবাবু বন্ধুগণের সহযোগে ৺মণিলাল সরকারের "উষা হরণ" নাটক অভিনয়ার্থ মনোনীত করিয়া তাহাতে ছাব্বিশখানি নূতন গীত রচনা করিয়া দিলেন। মহা উৎসাহে মহলা চলিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল। আটদিনের মধ্যেই "উষাহরণ" অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। উষাহরণের একটিমাত্র গীত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। * নিম্নে সে গীতটি উদ্ধৃত হইল।

ললিত বিভাস আড়াঠেকা।

পোহাল' যামিনী, বহে ধীরে সমীরণ।
ধূসর-বরন শশী তারকাহীন গগন॥
গাহিছে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ॥
বিনোদে বিদায় দিয়ে, কাতরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুনঃ পাইব মিহিরে, হবে শুভ সম্মিলন॥

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ, ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

'সধবার একাদশী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনীত হইলে, দীনবন্ধুবাবু গিরিশচন্দ্রকে "লীলাবতী" নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন গিরিশচন্দ্রের আদেশ অনুসারে সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র রিহার্সেল দিতে আরম্ভ করিল। এই সম্প্রদায়ের ষ্টেজ ম্যানেজার ছিলেন—স্বর্গীয়

* সংপ্রাপ্ত উষাহরণ নাটকের অপূর্ব্বপ্রকাশিত দুইটি গীত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নাট্যমন্দিরের আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। নাঃ সং।

ধর্ম্মদাস সুর ;—যিনি কালে সর্ব্বজন পরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপীঠশিল্পী বলিয়া নাট্যজগতে আখ্যাত হইয়াছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মদাস বাবুর তত্বাবধানে stage নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। লীলাবতীর রিহার্সেল চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটাদিও প্রস্তুত হইতে লাগিল। stage সম্পূর্ণ হইলে বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রপালের আবাসভবনে নূতন stage বাঁধিয়া 'লীলাবতী' প্রথম অভিনীত হইল।

যখন সম্প্রদায় দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাটকাভিনয়ের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন—তখন একদিন গিরিশ বাবু সহসা শুনিলেন—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু ও সাধারণী সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের শিক্ষাবিধানে কিছু কিছু বাদ দিয়া ও পরিবর্ত্তন করিয়া চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী" অভিনীত হইয়াছে। গিরিশ বাবু এই সংবাদ পাইয়াই প্রস্তাব করিলেন, নাটকের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া, নাট্যকারের একটী কথাও বাদ না দিয়া আমরা অভিনয় করিব—শুধু অভিনয় নহে, চুঁচড়ার দলকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত করিব।"—অতঃপর মহা সমারোহে রিহার্সেল দিয়া শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হইল। অভিনয় রজনীতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এবং স্বয়ং নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন। গিরিশ বাবু ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু অভিনয়-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অভিনয়ান্তে অতি ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া বলেন,—"এবার চিঠি লিখবো ছুয়ো বঙ্কিম।" গিরিশ বাবুকে বলেন,—"আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না ; take this complement at last 'লীলাবতী' অভিনয় হইতে এই থিয়েটার-সম্প্রদায় 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামে অভিহিত হয়।

সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ।

এইরূপে বাগবাজার থিয়েটার সম্প্রদায় "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" অভিনয় করিয়া এরূপ যশ লাভ করে যে, সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থ বহুসংখ্যক দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইত এবং শত শত ব্যক্তি স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইত। এ নিমিত্ত সম্প্রদায় "ফ্রি টিকিট" বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টিকিটের নিমিত্ত এরূপ জনতা ও এত অধিক চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল যে, সম্প্রদায় নিয়ম করিলেন, যে সে লোককে টিকিট দেওয়া হইবে না, যাঁহারা অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকেই টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেকে আপন আপন উপযুক্তভার "সার্টিফিকেট" লইয়া, অভিনয়রাত্রির তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতে দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন। যাহাই হউক, সম্প্রদায় তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতটস্থ সুন্দর বৈঠকখানায় "নীলদর্পণের" রিহারস্তাল দিতে লাগিলেন। রিহারস্তাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্প্রদায়, উক্ত থিয়েটারের "স্তাসান্তাল থিয়েটার" নাম দিয়া টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র অসম্মত হন। তিনি বলেন,—"আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে "স্তাসান্তাল থিয়েটার" নাম দিয়া, টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।" কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—যাঁহার বিপুল অধ্যবসায় গুণে সুশিক্ষিত হইয়া, তাঁহারা, "নীলদর্পণ" অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই গিরিশ বাবুর কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশ বাবু, তাঁহার বহু যত্নের শিক্ষাদানের "নীলদর্পণ" অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে সে কৌতূহল

নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

সঙের পালা

এই সময় বাগবাজারে একটি যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ বাবু তাহাদিগকে একটি সঙের পালা বাঁধিয়া দেন। প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর প্রহসনের একটি ভূমিকা লইয়া নিম্নলিখিত গীতটি গাহিতেন। গানটি 'প্রয়াগের' লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগিরথীর বর্ণনাত্মক। গানটিতে পরিত্যক্ত 'ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়স্থ' তাৎকালীক প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতার নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত ছিল। *

(কবির সুর)

লুপ্ত বেণী ১ বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ ২ অর্দ্ধ ইন্দু ৩ কিরণ ৪
সিঁদুর মাখা মতির ৫ হার॥
নগ ৬ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায় ৭
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব ৮ শম্ভুসুত ৯ মহেন্দ্রাদি ১০
যদুপতি ১১ অবতার॥

* চিহ্নিত মাত্রার অর্থ এইরূপ:—১। দলের প্রেসিডেন্ট—৺ বেণীমাধব মিত্র। ২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র—অভিনেতা। ৩। ৺ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—পরিচয় অনাবশ্যক। ৪। ৺ কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৫। ৺ মতিলাল সুর—প্রসিদ্ধ অভিনেতা। ৬। ৺ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৭। সরস্বতী ক্ষীণকায়—অর্থাৎ অল্পবিদ্যা। ৮। ৺ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৯। ৺ কার্ত্তিক চন্দ্র পাল। ১০। ৺ মহেন্দ্রলাল বসু—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—অভিনেতা। ১২। ব্রাহ্ম সমাজের নায়ক—৺ বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়

অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু ১২ করে গান,
কিবা ধর্ম্ম ১৩ ক্ষেত্র ১৪ স্থান,
অবিনাশী ১৫ মুনিঋষি করছে ব'সে ধ্যান ;
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু ১৬ কর' পার ॥

কিবা বালুময় বেলা ১৭,
পালে পাল ১৮ স্রেতের বেলা ১৯
ভুবনমোহন ২০ চরে ২১ করে গোপালে ২২ খেলা ;
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা ২৩
নীলের ২৪ গোড়ায় দিচ্চে সার ২৫ ॥

কলঙ্কিত শশী ২৬ হরষে, অমৃত ২৭ বরষে,
জ্ঞান হয় বা দীনের ২৮ গৌরব এতদিনে খসে ;
স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ী—
পয়সা দে দেখে বাহার ২৯ ॥

—ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন। ১৩। ৺ ধর্ম্মদাস সুর—ষ্টেজ ম্যানেজার। ১৪। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি—অভিনেতা। ১৫। ৺ অবিনাশ চন্দ্র কর—অভিনেতা। ১৬। নাট্যকার ৺ দীনবন্ধু মিত্র। ১৭। ৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল পাল প্রভৃতি পাল-বংশীয় কয়েকজন। ১৯। স্রেতের বেলা—রাত্রিতে রিহার্সেল হইত। ২০। ভুবনমোহন নিয়োগী। ২১। চরে অর্থাৎ বেড়ায়। ভুবন বাবুর কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। ২২। ৺ গোপাল চন্দ্র দাস—অভিনেতা। ২৩। সদগোপ জাতীয় অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ২৪। নীলদর্পণ নাটক। ২৫। সার অর্থাৎ বিষ্ঠা ; এস্থলে কার্য্যনিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে। ২৬। শশিভূষণ দাস—অভিনেতা। ২৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—পরিচয় অনাবশ্যক। ২৮। ৺ দীনবন্ধু মিত্র। ২৯। সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায়, কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ রহিল না,—অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।

এদিকে সম্প্রদায় কলিকাতা, যোড়াসাঁকো ৺ মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে (উপস্থিত যথায় ঘড়ীওয়ালা বাড়ী হইয়াছে) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ ৭ই ডিসেম্বর তারিখে, নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই গিরিশবাবু ৭৫৲ টাকা বেতনে জন 'অ্যাটকিন্‌সন কোম্পানীর' আফিসে সহকারী বুক কিপারের কার্য্য করিতেছিলেন। ক্রমে ন্যাসনাল সম্প্রদায় জামাই ব্যারিক, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি কয়খানি নাটক অভিনয় করিয়া, পরে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ার্থে নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু ভীম-সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গিরিশবাবুর আবশ্যক। সম্প্রদায় ইতস্ততঃ করিয়া, সদলে গিরিশবাবুর বাটী আসিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। শৈশব-বন্ধুগণের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না,—অবৈতনিক ভাবে তিনি থিয়েটারে যোগ দিয়া আফিস ও থিয়েটারের দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায়, কৃষ্ণকুমারী নাটকের হাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইত—"ভীমসিংহ—A distinguished Ama-teur' কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ে রাণী ভবানীর প্রপৌত্র নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, স্বহস্তে আপনার রাজপরিচ্ছদে গিরিশ-বাবুকে ভীমসিংহ সাজাইয়াছিলেন। ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল। কার্য্যের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত সকলে গিরিশবাবু, অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয়কে ডাইরেক্টার নির্ব্বাচিত করেন। ইহাতে কার্য্যের সুবন্দোবস্ত হইলেও পরে সভ্যগণের আত্ম-বিচ্ছেদে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়া, ন্যাসন্যাল থিয়েটার সান্ন্যাল ভবন হইতে স্থানান্তরিত হইল।

পরিত্যক্ত সম্প্রদায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

অত্যল্পকাল মধ্যে উভয় দল পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত ভুবন-

গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা

মোহন নিয়োগীর সত্বাধিকারীত্বে উপস্থিত মিনার্ভা থিয়েটারের জমীতে—"গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া বৃহৎ স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গিরিশ বাবু প্রথমে এ দলে ছিলেন না, পরে অনুরোধে পড়িয়া, মধ্যে মধ্যে অবৈতনিক (Amature) ভাবে অভিনয় করিতেন। এই সময়ে তিনি বঙ্কিমবাবুর 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন এবং মাউসি, Charitable dispensary, Hos & Bull প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যান্টোমাইনও অভিনয়ার্থে রচনা করিয়াছিলেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

এই সময়ে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ অনুরাগ জন্মে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুস্তক অধ্যয়নে প্রতিবাসী ও দীন-দরিদ্রগণকে বিনা ব্যয়ে ঔষধ ব্যবস্থা দানে আরোগ্য করিয়া এরূপ যশোলাভ করেন যে, একদিন পল্লীস্থ জনৈক ভদ্রব্যক্তি তাঁহার এক প্রবীণা আত্মীয়াকে গঙ্গাতীরস্থ করেন। গিরিশবাবু রোগীকে দেখিয়া ঔষধ দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাছে রোগী আরোগ্যলাভ করে ও তাঁহাকে পুনরায় গৃহে আনিতে হয়, এই ভয়ে তিনি গিরিশবাবুর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার চিকিৎসার উপর তৎকালে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে ঔষধ দিতেন, তাহাদিগকে যথাসময়ে ফলাফলের সংবাদ দিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন—এমন কি অনেক সময়ে ঔষধের ফলাফল জানিবার জন্য, আফিসের কার্য্যে তিনি অন্যমনস্ক হইতেন এবং রাত্রে তাঁহার ঔৎসুক্যবশতঃ নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে যথাসময়ে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করিত, কেহ বা সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া, আর তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎই করিত না। এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একপ্রকার পরিত্যাগ করেন।

শেষ জীবনে আবার বিশেষ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দীনদরিদ্র তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও বিনা মূল্যে ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অতি দরিদ্র পথ্যের নিমিত্ত সবল না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অর্থ সাহায্য পাইত।

আফিসের বড় সাহেব মিঃ অ্যাটকিন্‌সন গিরিশবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। গিরিশবাবুর তথায় ছয় বৎসর কার্য্যের পর, অ্যাটকিনসন্ বিলাত গমন করিলে, আফিসের ছোট সাহেবের সহিত তাঁহার কথান্তর হওয়ায়, তিনি উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, "ইণ্ডিয়ান লিগে" হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের সায়ত্ত শাসন প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বিরুদ্ধ হওয়ায় মধ্যম শ্রেণীর প্রতিনিধি হইয়া এই ইণ্ডিয়ান লিগ বিশেষ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীত্ব ত্যাগ করিয়া, সম্প্রদায়ের সভ্যগণ মধ্যে উক্ত রঙ্গালয় ভাড়া দিলেন। অধ্যক্ষতার ভার গিরিশবাবু গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি মেঘনাদবধ, পলাশীর যুদ্ধ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যোপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন এবং স্বয়ং আগমনী, অকালবোধন, দোল-লীলা প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্যও অভিনয়ার্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘনাদ, রাম, ক্লাইব, নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ, পশুপতি প্রভৃতি ভূমিকার (part) অভিনয় দেখিয়া বিজ্ঞমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধে তিনি মেঘনাদ ও রামের দুইটী ভূমিকাই অভিনয় করিতেন। এককালীন এই দুইটী বৈষম্য অংশ, এক ব্যক্তি দ্বারা তুল্যরূপ উৎকৃষ্টভাবে অভিনীত

হইতে দেখিয়া, দর্শকমণ্ডলী যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত কল্পতরু প্রণেতা সুরসিক শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গে গিরিশ অপেক্ষা যে, কোন দেশে গ্যারিক অধিক ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।"

স্ত্রী-বিয়োগ।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। প্রথমে তাঁহাকে তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ক্রমে দিন দিন সেই শোক গাঢ় হইয়া, তাঁহাকে সকল কার্য্যে উদাসীন করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিকট যে সকল রচিত কবিতা, গীত বা পুস্তক অপ্রকাশিত হইয়া রক্ষিত ছিল, সে সকল, এমন কি—অধ্যয়নের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, "ফ্রাইবার্গার কোম্পানীর" আফিসে বুককিপার হইয়া ভাগলপুরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি অবসর মত ধুতুরা, আঁধার, চাতক, শৈশব-বান্ধব, হলদীঘাটের যুদ্ধ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। "নলিনী" নামক মাসিক পত্রিকায় এই সকল কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। "হলদীঘাটের যুদ্ধ" কবিতা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, অক্ষয় বাবু তাঁহার "সাধারণী" পত্রিকায়, উক্ত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—'এরূপ গভীর শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল।'

ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি "পার্কার কোম্পানীর" আফিসে দেড়শত টাকা বেতনে, বুককিপারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

কিছুদিন পরে প্রতাপচাঁদ জহুরী, "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের" সত্ত্বাধিকারী হইয়া,গিরিশবাবুকে ম্যানেজার হইবার নিমিত্ত, বিশেষ অনুরোধ করিলে, নাট্যানুরাগবশতঃ তিনি আফিসের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একশত টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের" অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। থিয়েটারের কার্য্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী হইলেন। এখানে তাঁহার রচিত প্রথমে মায়া-তরু, পরে মোহিনী-প্রতিমা, আলাদিন, আনন্দরহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু বধ, সীতাহরণ, রামের বনবাস, সীতার বিবাহ, লক্ষণ বর্জ্জন, মলিনমালা, ভোটমঙ্গল, ব্রজবিহার প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্যাদি অভিনীত হয়। রাবণবধ তাঁহার প্রথম নাটক। রাবণ-বধ নাটকে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রনাথ বাবু, গিরিশবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অধ্যক্ষতা।

অতঃপর গিরিশ বাবু পণ্ডিতবর রমেশচন্দ্র দত্তের "মাধবীকঙ্কণ" নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকে গিরিশ বাবু একাদিক্রমে সাতটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় কুশলতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া জহুরী মহাশয়ের সহিত গিরিশ বাবুর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তিনি গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

এই সময় গুর্ম্মুখ রায় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বত্ত্বাধিকারীত্বে গিরিশবাবু, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতিকে লইয়া নূতন সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক "ষ্টার" থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কথা। বিডন ষ্ট্রীটের ৬৮ নং বাটীতে এই নব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত

ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতা।